বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

প্রণব ভট্ট

তুমি সুন্দর

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

তুমি সুন্দর / প্রণব ভট্ট

দিব্য প্রকাশ

A
BANGLAPDF.NET
PRESENTS

তুমি সুন্দর

প্রণব ভট্ট

পঞ্চম মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০২
চতুর্থ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০০
তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০০

তুমি সুন্দর
প্রণব ভট্ট

প্রকাশক
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
সালমানী মুদ্রণ
নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৫০ টাকা

ISBN 984 483 037 2

তুমি সুন্দর

প্রণব ভট্ট

Scan & Edited By:

Suvom

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

উৎসর্গ

প্রিয় বন্ধু, প্রিয় ছড়াকার
লুৎফর রহমান রিটন

A
SUVOM
CREATION

এক হাতে মাঝারি সাইজের পুরানো একটা স্যুটকেস, অন্য হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে ডলার যখন সদরঘাটে লঞ্চ থেকে নামে, ঢাকা মহানগরীতে তখন ভোর। সমগ্র সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল জুড়ে তখন ভোরের আবছা আলো-আঁধারি।

সকাল না হওয়া পর্যন্ত সদরঘাট টার্মিনালেই বসে থাকবে ভেবে লঞ্চ থেকে নেমেই সোজা একটা খালি বেঞ্চ দেখে বসে।

সারারাত লঞ্চে কাটিয়েছে। একটানা জার্নিতে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। হাই তুলে শরীরের আড়মোড়া ভেঙে বুক পকেট থেকে শোয়েব আখন্দের বনানীর ঠিকানা বের করে আরও একবার পড়ে।

টার্মিনালের আলোয় ঠিকানাটা চোখের সামনে মেলে ধরে নিজের অজান্তেই ফিক্ করে হেসে ফেলে। হ্যাঁ, তাই তো, মা'র লেখা শোয়েব আখন্দের এ ঠিকানা পড়তে–পড়তে শ' খানেকবারেরও বেশি পড়া হয়ে গেছে কি না কে জানে ! কে জানে, হয়তো বা শচীন টেন্ডুলকারের শতরান করার মতো শতবারই পড়া হয়ে গেছে !

আড়চোখে নিজের মাঝারি সাইজের চামড়ার স্যুটকেস ও পলিথিন ব্যাগের দিকে তাকায়। স্যুটকেসে নিজের শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি, গেঞ্জি এসব। পলিথিনের ব্যাগভর্তি জিনিসগুলি আসলে আনতে চায়নি। মা জোর করেই ব্যাগটা হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন।

ব্যাগভর্তি পিঠা, নাড়ু, মোয়া হাতে গুঁজে দিয়ে মা বলেন, 'তোর শোয়েব চাচা ছেলেবেলায় নাড়ু, ভাপা পিঠা এসব খুব খেতেন। আর তোর প্রিয় হচ্ছে মোয়া। পথে ক্ষিধে পেলে খাবি বাবা।'

'তুমি কি মনে করো বড়লোক শোয়েব আখন্দ এসব এখন মুখে দেবেন মা ?'

ছেলের কথায় মা সম্ভবতই দুঃখ পেয়ে বলেন, 'নাম ধরে এভাবে বলছিস কেন

বাবা ? উনি তোর চাচা। তাছাড়া বড়লোক হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, তা তো নয়।'

'তোমার কথায় শুধু আমি যাচ্ছি মা। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে বিদঘুটে লাগছে। শোয়েব আখন্দ বাবার বন্ধু ছিলেন। এই মোমিনপুরেই ছাত্র জীবন কাটিয়েছেন, শুধু এভাবেই উনি আমার চাচা ?'

'ওনারা দু'জন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ঠিক মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো।'

'পাঠাচ্ছ মা, তাই যাচ্ছি। কিন্তু এত ধনী মানুষ, দূর-দূর করে তাড়িয়ে না দিলেই হয়। তাছাড়া শোনো মা, বিরাট বড় লোকেরা নাড়ু, পিঠা, মোয়া এসব খান না। ওনারা কি খান জানো ? চপ, কাটলেট, পুডিং এসব।'

'তুই নিয়ে যা বাবা। খাবে, নিশ্চয়ই খাবে। আমাদের বাড়িতে লজিং থেকে পড়াশুনা করেছেন। আমার হাতের পিঠা, পায়েস কত খেয়েছেন।'

মা'র পা ছুঁয়ে সালাম করে ডলার বলে, 'দোয়া করো মা, তোমার মুখ যেন উজ্জ্বল করতে পারি।'

মা চোখের পানিতে ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেন, 'পারবি বাবা, নিশ্চয়ই পারবি। সোবান মাস্টারের ছেলে তুই। সততা আর নিষ্ঠা তোর রক্তে মিশে আছে। দুঃখ শুধু তোর বাবা দেখে যেতে পারলেন না, তুই এই মোমিনপুর গ্রামে থেকেই বি,এস,সি, পর্যন্ত স্ট্যান্ড করে এম,এস,সি, পড়তে আজ শহরে যাচ্ছিস।'

মা'র কথা মনে হতে এই টার্মিনালের বেঞ্চে বসেই দু'চোখ জলে ভরে ওঠে ডলারের। এ কথা সে ভালই জানে, মা'র স্বপ্ন-সাধ সব তাকে ঘিরেই। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। কখনই নামাজ কাজা করেন না। জায়নামাজে বসে সন্তানের মঙ্গল কামনায় দু'হাত তুলে চোখের জলে মোনাজাত করেন।

ঠিকানাটা আরও একবার পড়ে যত্ন করে বুক পকেটে ভরে রাখে। ঠিকানা লেখা ছোট্ট কাগজটার সঙ্গে মা শোয়েব চাচাকে খামে ভরে একটা চিঠিও লিখেছেন। খামের উপর 'প্রতি, শোয়েব আখন্দ' লিখে আঠা দিয়ে খামের মুখ বন্ধ করে ঠিকানা লেখা কাগজটার সঙ্গে চিঠিটাও ডলারের হাতে দিয়েছেন।

চারদিকে একটু-একটু করে সকালের আলো ফুটছে দেখে, এক হাতে স্যুটকেস ও অন্য হাতে পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় একটা খালি রিক্সা থামায়।

'কই যাইবেন ?'

রিক্সাওয়ালার প্রশ্নের উত্তরে 'বনানী যাবে' বলতেই রিক্সাওয়ালা হাসে। রিক্সাওয়ালার হাসি দেখেই বুঝতে পারে, কোথাও কী যেন একটা ভুল হয়েছে।

'হাসছেন কেন ভাই ?'

'ঢাকা শহরে নতুন আমদানি মনে লয়।'

মানুষ কী কোনও পণ্য নাকি ! আমদানি বলছে কেন লোকটা বুঝতে পারে না। এই বিশাল ঢাকা মহানগরীতে এর আগে আসেওনি কোনও দিন, তাই এখানকার মানুষজন সম্পর্কে, মানুষজনের কথা-বার্তা সম্পর্কে কোনও পূর্ব ধারণাও নেই তার।

'হ ভাই, এর আগে কোনও দিন ঢাকা আসি নাই।'

রিক্সাওয়ালা নিজের সিট থেকে নেমে গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বলে, 'নারে সাব, আপনের শরম পাওনের কিছু নাই। এগার বছর আগে আমিও ভোলা থেইকা আইসা পরথম যেই দিন সদরঘাটে লঞ্চ থেইকা নামলাম, হেই দিন এইরহম ভুলই করছিলাম। রিক্সা থামাইয়া একইরহম কইলাম, ভাই টঙ্গী যাইবা ? হেই বেডা রিক্সাওয়ালা তো আমার কথা শুইনা হাইসা মরে ! না সাব, বেশি প্যাচাল পাইড়া লাভ নাই। তয় হুনেন, বনানী ম্যালা দূর। একটা বেবী লইয়া চইলা যান গা।'

পঞ্চাশ টাকায় একটা বেবীট্যাক্সি রফা করে উঠে বসে।

ঠিকানা মিলিয়ে যখন শোয়েব আখন্দের বনানীর বাড়ির সামনে এসে পৌঁছে, তখনই ঘটে বিপত্তি !

গেটের সামনে বেবীট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে স্যুটকেস ও ব্যাগভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে বেবী থেকে নামতেই শোয়েব আখন্দের ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া হাইফাই মেয়ে রিংকির সঙ্গে পলিথিন ব্যাগের লাগে ধাক্কা !

যা হবার তাই হয়। ভাপা পিঠা, মোয়া ও নাড়ুর অধিকাংশই রাস্তার ধুলো-বালির মধ্যে ছিটকে পড়ে।

ট্র্যাকসুট পরে জগিং করে বাড়ি ফিরছিল রিংকি। এরকম ঘটনায় শোয়েব আখন্দের আদরের মেয়ে স্বভাবতই রেগে যায়। রেগে গিয়ে বলে, 'রাবিশ।'

ডলার টাল সামলাতে না পেরে নিজেও পড়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে নিজের শার্ট-প্যান্ট ও গায়ের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বলে, 'রাবিশ বলছেন কাকে ? আমাকে ?'

'কেন, বুঝতে পারছেন না ?'

ডলার এমন সুন্দর মেয়ে আর কখনও দেখেনি ! এমন একটা হুরপরীর মতো সুন্দর মেয়ের এমন রেগে কথা বলা দেখে, স্বভাবতই ভাল লাগে না ডলারের। তাই বলে, 'দেখুন, রেগে যাওয়া উচিত ছিল আমার, কিন্তু–'

ডলারের মুখের কথা শেষ হয় না। মুখ থেকে ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে রিংকি আরও রেগে গিয়ে বলে, 'আপনি রাগ করবেন ? বাট হোয়াই ? কিন্তু কেন ?'

ডলার কেন যেন মজা পায়। মজা পেয়ে বলে, 'বাংলা ও ইংরেজি দু'টোই বলার কোনও দরকার নেই। বাট হোয়াই কিংবা কিন্তু কেন, যে কোনও একটা বললেই তো হয়। আমি রাগ করব কেন জানতে চান ? এই যে আমার চাচার জন্যে আমার মা'র নিজের হাতের বানানো মোয়া, নাড়ু, পিঠা সব ধুলোয় গড়াচ্ছে, তার জন্যে দায়ি কে ? বলুন আপনি, কে ?'

'আমি ? আপনি বলছেন, আমি দায়ি ?'

'দেখুন, আমি কিন্তু সরাসরি আপনাকে দায়ি করিওনি, করতে চাইও না। আমার চোখে পড়েনি যে আপনি–'

মুখের কথা এবারও শেষ হয় না ডলারের। একই ভাবে মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে রিংকি বলে, 'আমাকে আপনার চোখে পড়েনি ? ডু ইউ মিন ইট ?'

'সত্যি বলছি, মিথ্যে আমি বলি না। আপনাকে আমার সত্যি চোখে পড়েনি।'

ডলারের কথা শুনে রিংকি বোধহয় আরও রেগে যায়। রেগে বলে, 'মাধুরী, কাজল, শ্রীদেবীর মতো এই আমাকে যে কোনও লোক মাথা ঘুরিয়ে একবার নয়, বার-বার দেখে । আর আপনি কি না-'

অত্যধিক কৌতূহলে ডলার এবার রিংকিকে কথার মাঝেই থামিয়ে দেয়। থামিয়ে বলে, 'মাধুরী, শ্রীদেবী, কাজল ওনারা কে ? আপনার সঙ্গে পড়ে বুঝি ? খুব সুন্দর নিশ্চয়ই ? ঠিক আপনার মতো ?'

ডলারের কথা শুনে রিংকি হতভম্ব হয়ে যায় ! দ্রুত বলে, 'শ্রীদেবী, মাধুরী, কাজল, এদের কাউকে চেনেন না ? বলেন কী আপনি ? হাউ ফানি !'

'কী জানি, না চিনে হয়তো ভুলই করেছি। আপনার বান্ধবী হলে দয়া করে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। কিন্তু ঝগড়া ফ্যাসাদ যাই করি, আমার মোয়া, নাড়ু সব কিন্তু গেল।'

'হোয়াট ইজ মোয়া ? হোয়াট ইজ নাড়ু, বলুন তো ?'

রিংকির প্রশ্ন শুনে হাসি পেলেও অনেক কষ্টে হাসি চেপে ডলার বলে, 'এ দেশের একটা মেয়ে, অথচ মোয়া, নাড়ু চেনেন না ? হাউ ফানি !'

রিংকি বুঝতে পারে, তার 'হাউ ফানি' কথাটা তাকেই ফিরিয়ে দিল। স্বভাবতই যারপরনাই রেগে যায় ! রেগে কটমট করে ডলারের দিকে একবার তাকায় ! কী বলবে না বলবে ঠিক বুঝতে পারে না।

কেন যেন আর দাঁড়ায় না। দ্রুত গেটের দিকে এগুতে গিয়েও আরও একবার মাথা ঘুরিয়ে কটমট করে ডলারকে দেখে।

ডলার দেখে বন্দুক হাতে উর্দিপরা দারোয়ান সেলাম ঠুকে গেট খুলে দাঁড়িয়েছে। দারোয়ানের সালামের জবাবে রিংকি মাথা ঝাঁকিয়ে হন্‌হন্ করে হেঁটে সোজা

বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়।

এবার ধীরে-ধীরে দারোয়ানের সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখে কিছু না বলে মা'র হাতের লেখা চিঠি ও ঠিকানা লেখা কাগজটা দারোয়ানের হাতে তুলে দেয়।

বন্দুক হাতে উর্দিপরা মোটাসোটা গোঁফওয়ালা দারোয়ান ঠিকানা পড়ে বলে, 'হ, ঠিকানা ঠিক আছে।'

'আর মালিকের নাম ?'

'হ, আছে। হেইটাও দেখি ঠিক আছে।'

ডলার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ! বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকেই ঠিকানাটা কেবল পকেট থেকে বের করে পড়েছে আর ভেবেছে, এত বড় এই ঢাকায় ঠিকমতো শোয়েব চাচার বাড়ি খুঁজে পাব তো ? বুক ভরা স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে তাই বলে, 'যাক, বাঁচা গেল, কী বলেন ? তা আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে দারোয়ান ভাই।'

'জ্বি, বলেন ?'

'অনেক লম্বা সফর করে এসেছি তো, এই স্যুটকেসটা যদি একটু ভেতরে নিয়ে যেতেন।'

বন্দুক হাতের উর্দিপরা ভুঁড়িওয়ালা মোটাসোটা দারোয়ান তার ভুঁড়ি নাচিয়ে হেসে বলে, 'কী যে কন, আপনের নিজেরই ঢোকনের খবর নাই, আবার আপনার স্যুটকেস ভিতরে ঢুকব ?'

সারা রাত লঞ্চ জার্নির ধকল, ঠিকানা মতো বাড়ি পাওয়া যাবে কি না–এই টেনশন, একটা বদরাগী মেয়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগা এবং অহেতুক বাক্য বিনিময়–সব কিছু মিলিয়ে মনটা তিক্ত-বিরক্ত হয়েছিল। দারোয়ানের কাছ থেকে এ বাড়িই শোয়েব চাচার জানার পর মুহূর্তেই মনটা খুশিতে নেচে ওঠে। কিন্তু এই মোটাসোটা দারোয়ানের কথা শুনে আবার দমে যায়। দারোয়ানের কথার শানেনজুল কিছুই বুঝতে পারে না।

'বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না কেন, দারোয়ান ভাই ?'

'অপরিচিত কারও বাড়ি ঢোকা নিষেধ।'

'চিঠির মধ্যে মা নিশ্চয়ই আমার পরিচয়, ঢাকা কেন এসেছি সব লিখে দিয়েছেন। দেখেন ভাই দারোয়ান, সারা রাত লঞ্চে ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে এসেছি। একটুও ঘুমাতে পারিনি। আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে দয়া করে ভেতরে যেতে দিন।'

দারোয়ান এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার গেটের এক পাশে তার জন্যে নির্দিষ্ট একটা চেয়ারে গিয়ে বসে।

নরমাল একজন মানুষের জন্য নরমাল একটা চেয়ারে এই বিরাট দেহ নিয়ে কী করে বসেছে লোকটা, ভেবে অবাক লাগে !

দারোয়ান কিছু বলছে না দেখে ডলার আবার বলে, 'ভাই, আমার মা'র লেখা চিঠিতে আমার নাম-ধাম, পরিচয় আছে। আমাকে দয়া করে ভেতরে যেতে দিন।'

দারোয়ান পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দিয়াশলাই দিয়ে ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে, নাকে-মুখে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'হইব না। সাহেবের হুকুম ছাড়া বাড়িতে কারও ঢোকা নিষেধ আছে।'

এ সময় বাড়ির ভেতর থেকে গাড়ির হর্ন শুনে দারোয়ান চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়ায়। দরজা খুলে গাড়ি বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটেন্‌শান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়ি গেটের কাছে এলে গাড়িতে বসা ভদ্রলোককে সালাম ঠোকে। ডলার দেখে ভদ্রলোক গাড়িতে বসেই মাথা ঝাঁকিয়ে সালামের জবাব দিলেন।

'ইনি বুঝি শোয়েব চাচা ?'

দারোয়ান ডলারের কথা শুনে এবার আর অবাক না হয়ে পারে না ! অবাক হয়ে বলে, 'আপনের চাচা, অথচ আপনে চিনেন না ? আরে ভাই, এইটা কী কন ?'

সত্যি তো, এ প্রশ্নের উত্তর সে কী দেবে ! এক মুহূর্ত ভেবে বলে, 'আমার দূর সম্পর্কের চাচা। তাছাড়া, মোমিনপুর গ্রামে উনি প্রায় বিশ-একুশ বছর যান না তো, তাই। আমার মনে হয় আপনি বোধহয় আমাকে যা-তা ধরনের উটকো একটা ঝামেলা ভাবছেন ভাই। বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই না?'

দারোয়ান আবার নিজের জন্য বরাদ্দ চেয়ারে গিয়ে বসে। বসে বলে, 'আমার এই চাকরির এক নম্বর কথাই হইল, অপরিচিত কোনও মাইনষেরে কিছুতেই বিশ্বাস করণ যাইব না। আমিও আপনের মতো গরিব মানুষ। আমি পারুম না, ভাই। আমারে আপনে ভাই, দয়া কইরা মাপ কইরা দিয়েন।'

নিজের তকদিরের লিখন দেখে নিজেই চমকে ওঠে ! হায়রে, দারোয়ান তাকে তারই মতো একজন মানুষ ভেবেছে ! কিন্তু কতটা গরিব ভেবেছে বুঝতে পারে না। এত বড় ধনী মানুষের বাড়ি, দারোয়ান হয়তো অনেক জনকেই নানা ছুতোয় সাহায্যের জন্য আসতে দেখে। সেই রকমের সাহায্য প্রার্থী কিংবা ভিখারি-টিকারি জাতীয় কিছু ভাবেনি তো আবার ! হায় আল্লাহ্, কপালে এও লেখা ছিল !

ঢাকা আসার আগে দামি কাপড়-জামায় ফিটফাট হয়ে আসার কথা ভাবেনি, তা নয় ! এমনিতেই নুন আনতে পান্তা ফুরায়, মাকে তাই নুতন শার্ট-প্যান্ট কেনাকাটার কথা বলে বিব্রত করেনি।

দারোয়ানের কথাটা শোনার পরই এই প্রথম, নিজের পরিধেয় শার্ট-প্যান্টের দিকে তাকায়। জার্নিতে যা নষ্ট হওয়ার তাতো হয়েছেই, তার উপর বেশি ময়লা হয়েছে আসলে ঐ পুতুলের মতো সুন্দর মেয়েটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে।

জার্নির কষ্ট, মেয়েটার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার কষ্ট কিংবা বাড়িতে ঢুকতে না দেয়ায় যে কষ্ট ছিল, দারোয়ানের তারই মতো একজন মানুষ ভাবায় ভেতরে কিন্তু এর চেয়েও বেশি কষ্ট অনুভব করে। কেন যেন মনে হয় কবির 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান' কথাটা আসলে বলা যায়, মানা যায় না।

ডলার আসলে জন্মের পর থেকে প্রাচুর্যের ছিটে-ফোঁটাও দেখেনি। দারিদ্র্যের শোক, তাপ, জ্বালা, সব তার দেখা, সব তার চিরচেনা। হ্যাঁ, গরিবী জীবন থেকে মুক্তি চায় সে। তাই বলে চুরি-চামারি করে যেনতেন প্রকারে বড় লোক হয়ে নয়।

'আচ্ছা দারোয়ান ভাই, চাচা তো অফিসেই গেলেন, নাকি ? চাচার অফিসের ঠিকানাটা যদি দয়া করে আমাকে দিতেন-'

দারোয়ান বোধহয় এবার বিরক্তই হয়। তাই কথার মাঝখানে বলে, 'ক্যান এত চাচা-চাচা করতাছেন ? চাচা-ভাতিজা কেউ তো কাউরে চিনেন বইলা মনে হইল না। লন, সাবের এই কার্ডখান লন। কে জানি কবে কার্ডখান গেটে ফালাইয়া গেছে। কী ভাইবা আমি তুইলা রাখছি। দেখেন, আপনের কামে লাগল। এর মধ্যে বেবাক ঠিকানা লেখা আছে, কেবল মোবাইল নম্বরটা নাই।'

ডলার অবাক হয়ে বলে, 'মোবাইল নম্বর কী দারোয়ান ভাই ?'

দারোয়ান হাসে। হেসে বলে, 'বুঝবেন, ঢাকা শহরে নয়া আসছেন তো, সবই বুঝবেন।'

কার্ডের ঠিকানা দেখে আবার একটা বেবীটেক্সিতে দাম-দর রফা করে উঠে বসে। মতিঝিলে বিশাল মাল্টিস্টোরিড অফিস খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না।

অফিসে ঢুকে তো আরও এক বিপত্তি ! শোয়েব আখন্দের খামাখা ইংরেজি বলা সুন্দরী পি, এ, কিছুতেই দেখা করতে দেবে না। এ যেন যাহা বায়ান্ন, তাহাই তেপ্পান্ন ! একই ঝামেলা।

হঠাৎ মা'র উপর ভীষণ রাগ হয়। রাগে, দুঃখে, অভিমানে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। একবার ভাবে, গ্রামে ফিরে গেলে কেমন হয় ? কথাটা ভাবতে গিয়েই বিধবা মা'র চির দুঃখী মুখ মানসপটে ভেসে ওঠে। এভাবে দেখা না করে ফিরে গেলে মা দুঃখ পাবে।

না, দেখা না করে কিছুতেই যাবে না ডলার। অবশেষে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুন্দরী পি, এ, কে ম্যানেজ করে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিপাটি করে সাজানো-গোছানো বিশাল এক চেম্বারে গিয়ে ঢোকে।

'স্লামালাইকুম চাচা।'

শোয়েব আখন্দ টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। 'আচ্ছা রাখি তাহলে' বলে টেলিফোন নামিয়ে রেখেই বলেন, 'ওয়ালাইকুম ! চাচা ! তুমি আমাকে চাচা বলছ কেন ?'

'লাগেজ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। বসি চাচা, কী বলেন ?'

'বসো।'

ডলার একটা খালি চেয়ারে বসে বলে, 'চাচাকে চাচা বলব না তো কী বলব ?'

শোয়েব আখন্দ বিরক্ত হন। বিরক্ত হয়ে বলেন, 'এমন পোশাক-আশাকে, লাগেজ-টাগেজ নিয়ে অফিসে, কী ব্যাপার ? কে তুমি ?'

'আমি বুঝতে পারছি এভাবে আসা ঠিক হয়নি। কিন্তু উপায় ছিল না চাচা।'

শোয়েব আখন্দ অনাহূত উটকো ঝামেলা দেখে রেগে যান। রেগে বলেন, 'কী তখন থেকে চাচা-চাচা বলছ ? কে তোমার চাচা ? আমি তোমাকে চিনি না।'

'আমিও আপনাকে চিনি না। হ্যাঁ, এর আগে দেখিওনি কোনও দিন।'

'তাহলে আমি তোমার চাচা, আর তুমি আমার ভাজিতা হও কী ভাবে ?'

'আমার নাম শাকিল আহমেদ, ডাক নাম ডলার। আমি মোমিনপুর গ্রাম থেকে এসেছি।'

'ডলার-পাউন্ড যাই বলো, ওরকম অনেকেই গ্রাম থেকে চাকরি কিংবা সাহায্যের জন্য আসে। তা তুমি কেন এসেছ ?'

সেই একই ভাবনা ভাবছেন। হায়রে, দারোয়ান মালিক উভয়েই তার চলন-বলন দেখে, তাকে ভিক্ষুক জাতীয় একজন মানুষ ভেবেছে ! রাগে, দুঃখে নিজের তকদিরকে ঝাঁটাপেটা করতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু দমে গেলে তো চলবে না। তাই বলে, 'আমি আসলে সাহায্য বা চাকরি কিছুই চাইতে আসিনি।'

শোয়েব আখন্দ অবাক হয়ে বলেন, 'তাহলে !'

ডলার এবার মরিয়া হয়ে বলে, 'আমি আসলে থাকতে এসেছি।'

'থাকতে এসেছ, মানে ?'

'আমি আপনাদের বাড়িতে থাকব বলে এসেছি।'

শোয়েব আখন্দ বিরক্ত না হয়ে পারেন না। তাই বলেন, 'মহামুশকিল হল দেখছি ! উড়ে এসে জুড়ে বসবে নাকি ? কী বলতে চাও তুমি ?'

'আমার মা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। মা বলেছেন, আপনি আমাকে কিছুতেই ফিরিয়ে দেবেন না, আমার নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন।'

অবাক হয়ে শোয়েব আখন্দ বলেন, 'কে তোমার মা ?'

যদি চিনতে না পারেন ! যদি বলেন, আমি চিনি না, আমি এ নাম এ জীবনে এই প্রথম শুনলাম ! তা হলে !

ডলার ভয়ে-ভয়ে বলে, 'আমার মা'র নাম নাজমা বেগম। বাবার নাম সোবান

আহ্‌মদ। তিনি স্কুল শিক্ষক ছিলেন।'

আচমকা যেন চমকে ওঠেন শোয়েব আখন্দ ! হঠাৎ কেমন যেন হয়ে যান ! কী যেন ভাবেন ! অস্ফুট বলেন, 'তুমি নাজমার ছেলে ?'

ডলার পকেট থেকে চিঠিটা বের করে শোয়েব আখন্দের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'মা এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বলেছেন।'

শোয়েব আখন্দ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেন এবং খাম খুলে পড়ে বলেন, 'তোমার মা এখন কেমন আছেন ?'

'জ্বি, ভাল।'

'তা তুমি কত দূর পড়াশুনা করেছ ?'

জার্নির ক্লান্তি, গরিব শোনার দুঃখ, সব যেন এক নিমিষেই দূর হয়ে যায়। এ বাড়িতে থাকতে দিক বা না দিক, পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্য করুক কি না করুক, মুখ-চোখ দেখেই বোঝা যায় মা'র চিঠির মূল্য আছে লোকটার কাছে। তাই বলে, 'আমি বি,এসসি, পর্যন্ত স্ট্যান্ড করেছি। মোমিনপুর কলেজে অনার্স নেই বলে, আই,এস,সি-তে সেকেন্ডে স্ট্যান্ড করেও, বি,এসসি, পড়তে হয়েছে। আমি এম,এসসি, পড়তে ঢাকা এসেছি।'

'কিছু খেয়েছ ?'

'ইয়ে মানে, আমি আপনার জন্য কিছু মোয়া, পিঠা এসব এনেছি চাচা। কিন্তু -'

ডলারের মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই শোয়েব আখন্দ বলেন, 'আমি আমার খাওয়ার কথা নয়, বলছি সকাল থেকে তুমি কিছু খেয়েছ কি না ?'

ডলার কিছু বলে না। কেবল মাথা নিচু করে থাকে।

শোয়েব আখন্দ কলিং বেলের সুইচ টেপেন। পিয়ন এসে দ্রুত মাথা নিচু করে দাঁড়ায়।

'ড্রাইভারকে বলো, সাহেবকে বাসায় পৌঁছে দিতে। তুমি যাও, বাসায় গিয়ে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নাও। বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা হলে বাকি কথা হবে।'

মা ভুল ঠিকানায় পাঠাননি।

অপার খুশিতে মন ভরে যায় ডলারের। মা'র চিঠি পড়েই লোকটার ব্যবহার কেমন পাল্টে গেল ! মা'র একটা চিঠির এত দাম ! গর্বে বুক ভরে ওঠে ডলারের।

পিয়নের পিছু-পিছু গাড়িতে এসে বসে।

গাড়িও এয়ারকন্ডিশন্ড। অফিসের চেম্বার এয়ারকন্ডিশন্ড, কে জানে সমস্ত বাড়ি এয়ারকন্ডিশন্ড কি না !

ডলার বুঝতে পারে না, শোয়েব আখন্দ চাচা কত বড় ধনী ! তবে বিশাল ধন-সম্পত্তির মালিক, এটা বুঝতে পারে।

অবাক বিস্ময়ে দারোয়ান গেট খুলে রীতি মোতাবেক সালাম করে দাঁড়ায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে-খেতে ডলার মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে দারোয়ানের সালামের জবাব দেয়।

ডলার দেখে ভুঁড়িওয়ালা বিশাল দেহের দারোয়ান অবাক হয়ে চোখ মিটমিট করে তাকিয়ে গাড়ির পেছনের সিটে পায়ের উপর পা তুলে বসা তাকেই দেখছে !

বাড়িতে ঢুকে তো ডলারের আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাওয়ার অবস্থা ! শোয়েব চাচা ধনী সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এত ধনী বুঝতে পারেনি ! এত প্রাচুর্য, এত চোখ ধাঁধানো জীবন, এত বিলাস-ব্যাসন চোখে দেখা তো দূরের কথা, ভাবতেও পারেনি কখনও !

বিশাল বাড়ি।

সম্পূর্ণ বাড়ি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বাড়িময় পা ডেবে যাওয়া নরম নীল কার্পেট। দেয়ালে ঝুলছে দেশি-বিদেশি নানা চিত্তাকর্ষক শিল্পকর্ম। বাড়ির সামনে সমান করে কাটা সবুজ ঘাসের লন। লনের দু'পাশে নানা গাছ-গাছালি, ফুলের বাগান। বাগানে ফুটে আছে নানা রঙের বিচিত্র দেশি-বিদেশি জানা-অজানা সব ফুল।

বাথরুমে গোসল করতে ঢুকে তো একেবারে লা জবাব হয়ে যায়। বাথটাব, গিজারে গরম পানি, বিদেশি রঙিন টাইলস্। মোমিনপুর গ্রামেই জন্ম, মোমিনপুরে কেটেছে তার শৈশব, কৈশোর। এসব দেখে তো স্বভাবতই একবারে থ বনে যায় !

গোসল করে আসতেই আয়া ব্রেকফাস্টের জন্যে ডাকে।

টেবিলে খাওয়া-দাওয়া দেখেও হতভম্ব হয়ে যায়।

জ্যাম-জেলি, পাউরুটি, কাটলেট, একগ্লাস কী যেন কী ফলের রস।

চিরকাল সকালে চিড়া-মুড়ি নাস্তা করেছে। হঠাৎ এসব খাবার মুখে রোচে না।

তাছাড়া বুঝতে পারে, কাঁটা চামচ, ন্যাপকিন এসব ব্যবহার করে খেতে হবে। খালি প্লেটে কাঁটা চামচ ও ন্যাপকিন দেয়া আছে।

খাওয়া হয় না বললেই হয়।

কাঁটা চামচ ও খাবার নিয়ে কিছুক্ষণ আলতো নাড়াচাড়া করেই লিভিংরুমের দামি নরম সোফায় এসে বসে।

কাল বিকেল থেকে আসলে কিছু খাওয়া হয়নি। এসব কাটলেট, পুডিং মুখেও দেয়নি বলা যায়। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। পলিথিনের ব্যাগে এখনও কিছু মোয়া, নাড়ু ও পিঠা আছে। ব্যাগ থেকে একটা মোয়া নিয়ে সাত-পাঁচ না ভেবেই খেতে থাকে।

ঠিক এসময় রিংকি এসে লিভিংরুমে ঢোকে, সোফায় পা তুলে বসে ডলারকে মোয়া চিবুতে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলে, 'আপনি ! আপনি এখানে ! কে ঢুকতে দিয়েছে এখানে আপনাকে !'

'আমার চাচা।'

'আপনার চাচা ! কে আপনার চাচা !'

'জনাব শোয়েব আখন্দ। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। কিসের ব্যবসা জানি না। তবে বড় দয়ার শরীর। আপনার সঙ্গেই তো সকালে আমার ধাক্কাধাক্কি হয়েছিল, কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সে আমি কিন্তু আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তা আপনি কে বলুন তো ?'

'আমাদের বাড়িতে, আমাদের সোফায় আরামসে পা তুলে বসে, আমাকেই কিনা জিজ্ঞেস করছেন, আমি কে ?'

'এ বাড়ি আমার শোয়েব চাচার। আপনি কি ওনার কিছু হন, বলেন ?'

রিংকি কটমট করে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'আমি ওনার একমাত্র মেয়ে। কিন্তু ড্যাডি আপনার চাচা হন কী করে ?'

এ প্রশ্নে ডলার বোধহয় আঘাত পায়। বলে, 'কেন, আপনার বিশ্বাস হয় না ? আপনার ধারণা আমি মিথ্যে বলছি ?'

'আমার ড্যাডির কোনও ভাই-বোন নেই। উনি ওনার পিতার একমাত্র সন্তান, এটা জানেন ?'

ডলার অপমানিত বোধ না করে আর বোধহয় পারে না। তাই বলে, 'আপনার কথা শুনে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার বাবা একজন আদর্শ স্কুল শিক্ষক ছিলেন। জীবনে কখনও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। আমি যখন আমার মায়ের গর্ভে, তখন আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। আমার বিধবা মা আমাকে

মিথ্যে বলা শেখাননি। আমি পারতপক্ষে মিথ্যে বলা এড়িয়ে চলি।'

'আমার ড্যাডির কোনও ভাই-বোন নেই। তাহলে আপনিই বলুন, উনি কী করে আপনার চাচা হলেন ?'

ডলার কী আর করে, তাই বলে, 'আমার মা বলেছেন।'

'আপনার মা বলল আর আমার ড্যাডি আপনার চাচা হয়ে গেল ! রাবিশ ! আর শুনুন, ক্ষ্যাতের মতো এসব যা-তা জিনিস সোফার উপর এভাবে পা তুলে বসে খাবেন না। একটা সিনক্রিয়েট হয়েছে, বুঝতে পারছেন না ?'

কথা বলে আর দাঁড়ায় না ।

নিজের ঘরের দিকে চলে যায় রিংকি।

লিভিংরুমে কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই ! ঠিক এসময় মোটাসোটা ধরনের মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোক একগাল হেসে ডলারের মুখোমুখি এসে বসেন। ভদ্রলোকের সমস্ত চোখ-মুখে আভিজাত্যের সঙ্গে সারল্যের ছাপ। এক পলক দেখে বয়স বোঝা না গেলেও, কাঁচাপাকা চুল দেখে মোটামুটি বয়স যে কমসে-কম চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, তা অনুমান করা যায় ।

'শোনো, রিংকি তোমার উপর রেগেমেগে ফায়ার হয়ে আছে। সে জন্যেই, কে তুমি, কী তোমার পরিচয়, সব দেখতে এবং জানতে এলাম বালক।'

প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোকের কথা-বার্তা শুনে বেশ 'মাই ডিয়ার ম্যান' বলে মনে হয়। তবু কেন যেন ভদ্রলোকের বলা একটা শব্দের প্রতিবাদ না করে পারে না। প্রতিবাদ করে বলে, 'বালক নয়, যুবক। আমাকে দয়া করে বালক না বলে, যুবক বলবেন।'

কথা শুনে হেসে বলেন, 'গুড, ভেরি গুড ! আমার ভাই দিল সাফ, কথাও সাফ। তোমাকে কিন্তু আমার পছন্দ হয়েছে। তা তুমি কী খাচ্ছ ?'

'মোয়া।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে, মুড়ি ও গুড়ের প্রিপারেশান। ভেরি গুড ফুড। ছোট বেলায় খেয়েছি।'

কথা শুনেই ডলার বলে, 'আপনাকে দেব একটা ? খাবেন ?'

ভদ্রলোক হেসে বলেন, 'দেবে, দাও। বুঝলে ভায়া, খাবার দেখলে আমি আবার লোভ সামলাতে পারি না। আমার এ ভুঁড়ি এবং মোটাসোটা চর্বিওয়ালা শরীর দেখে তুমি নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারছ। খাওয়া আমার জীবনের কত প্রিয় সাবজেক্ট, তোমাকে যে কী বলব ভাই !'

একটানা কথা বলে থামেন। ডলারের দেয়া একটা মোয়া হাত বাড়িয়ে নিয়ে চিবুতে-চিবুতে বলেন, 'ওয়াণ্ডারফুল। গুড, রিয়েলি গুড প্রিপারেশান ! তা

তোমার মোয়া খাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে যাচ্ছি, তোমাকে আমার নাম-ধাম কিছু কিন্তু এখনও বলা হয়নি। আমি হচ্ছি এ বাড়ির কর্ণধার শোয়েব আখন্দের জান্নাতবাসিনী স্ত্রী সাহারা খানমের একমাত্র সহোদর। নাম আবুল খায়ের, ডাক নাম হীরা। স্থায়ী নিবাস আমেরিকার বিউটিফুল লাসভেগাস সিটিতে। ওখানে অবশ্য এসব সুস্বাদু মোয়া-টোয়া চর্ম চক্ষেও দেখি না, পিজা-টিজা খেয়ে বেঁচে থাকি।'

ভদ্রলোককে যত দেখে, তত ভাল লাগে। এবার নিজের নাম বলতে হয়, তাই বলে, 'আমার নাম শাকিল আহমেদ। ডাক নাম ডলার।'

হঠাৎ যেন ঝলসে ওঠেন ভদ্রলোক। দ্রুত বলেন, 'কী, কী বললে ? তোমার নাম ডলার ? আমার প্রিয় হচ্ছে আমেরিকা, আর তোমার নাম কিনা সেই আমেরিকার মুদ্রার নামে। ব্যাস, হয়ে গেল।'

ডলার এই উৎফুল্লতার শানেনজুল কিছুই বুঝতে পারে না। তাই বোকার মতো বলে, 'কী হয়ে গেল ?'

'হয়ে গেল বুঝতে পারছ না ? তোমার সঙ্গে আমার ইয়ে হয়ে গেল। আই মিন, বন্ধুত্ব হয়ে গেল, বুঝেছ ?'

ডলার অবাক হয়ে সাদামাটা ধরনের মানুষ এই ভদ্রলোককে দেখে। যত দেখে ততই ভাল লাগে।

ডলার কিছু বলে না। ভদ্রলোকই আবার বলেন, 'তুমি নাকি রিংকিকে বলেছ, আমার দুলাভাই তোমার চাচা ? তুমি এও বলেছ, তুমি জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলোনি। তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমারও বিশ্বাস, তোমার পক্ষে কখনও মিথ্যে বলা বোধহয় সম্ভব নয়। আর একটা কথা, তুমি আমাকে এখন থেকে ডায়মন্ড মামা বলে ডাকবে। নাম হীরা তো, তাই ডায়মন্ড মামাই বোলো। হীরা শব্দটা কেমন ম্যারাম্যারা লাগে।'

ঠিক এসময় রিংকি অগ্নিমূর্তি ধারণ করে লিভিংরুমে এসে দু'জনের দিকে রেগেমেগে তাকায়। তারপর বলে, 'ডায়মন্ড মামা, তুমিও এসব ছাইপাশ খাচ্ছ ?'

ডায়মন্ড মামা কিছু বলার আগেই ডলার বলে, 'ছাইপাশ বলছেন কেন ? বাংলাদেশের ঘরে-ঘরে এ খাবার খায়, এটি একটি সুস্বাদু খাবার।'

ডায়মন্ড মামা মোয়ার শেষ অংশ মুখে দিয়ে চিবুতে-চিবুতে বলেন, 'নারে রিংকি, রিয়েলি ভেরি গুড ফুড। যাকে বলে ফ্যান্টাস্টিক ! এই যে ডলার, তোমার ব্যাগ থেকে ওকেও একটা দাও। খেয়ে দেখ, ভুলবি না কখনও।'

রিংকি রেগে বলে, 'থাক, এত গুড ফুড আমার পেটে হজম হবে না ডায়মন্ড মামা। তা আপনার নাম ডলার বুঝি ?'

ডলার মাথা নেড়ে বলে, 'জ্বি।'

রিংকি ব্যঙ্গ করে বলে, 'অন্য ভাই-বোনদের নাম নিশ্চয়ই রিয়েল, দিনার, পাউন্ড, ইয়েন এসব ?'

হঠাৎ কেন যেন সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ডলার। রিংকির চোখে চোখ রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'আপনি এভাবে বলছেন কেন ? শুনুন, অন্যকে ছোট করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আর যাই হোক, নিজে বড় হওয়া যায় না।'

'গুড বলেছে, ভেরি গুড বলেছে। বলতে দ্বিধা নেই, এই ইয়াংম্যানের সত্যি লেখাপড়া আছে, জ্ঞান-বুদ্ধিও আছে।'

মামার কথা শুনে যেন ফুঁসে ওঠে রিংকি ! একই রকম চড়া গলায় বলে, 'আরে রাখো মামা, তোমার ওসব ফালতু জ্ঞান-বুদ্ধি। তা পণ্ডিত মশাই, কী ভাবে বড় হওয়া যায়, দয়া করে একটু বলবেন কী ?'

'যারা বড় মানুষ, তারা অন্যকে ছোট করে কথা বলে না। আপনার মতো অনাহূত টিজ ক'রে কথা বলে না। একটা প্রশ্ন করি, আপনি কী পড়েন ?'

'আমি এবার 'এ' লেভেল পরীক্ষা দেব।'

'তার মানে, আপনি এখন ছোট নন্। বড় হয়েছেন বলা যায়।'

'কেন ? আমাকে কচি খুকি মনে হয় নাকি আপনার ?'

ডলার রিংকির চোটপাট দেখে কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'আর একটা কথা বলি ?'

'একটা কেন, ইচ্ছে হলে একশটাও বলতে পারেন।'

'আচ্ছা, আপনি সব সময় এভাবে রেগে থাকেন কেন ?'

যেন ফুঁসে ওঠে রিংকি ! অত্যন্ত চড়া গলায় বলে, 'কী বলতে চান আপনি ?'

কী ভেবে একবার ডায়মন্ড মামার দিকে তাকায়, তারপর আবার রিংকির দিকে তাকিয়ে বলে, 'না বলছিলাম কী, সব সময় রেগে থাকা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল নয়। হাসি-খুশি মানুষ দীর্ঘায়ু হয়, শোনেননি ?'

রিংকি এতটাই রেগে যায় যে, কী বলবে না বলবে ঠিক বুঝতে পারে না। রেগে লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে শুধু বলে, 'ক্ষ্যাত ! আমি বলছি, আপনি একটা ক্ষ্যাত।'

'শুনুন।'

দরজার কাছে গিয়েও ডাক শুনে রিংকিকে দাঁড়াতেই হয়। ডলার এক পা-দু'পা করে রিংকির কাছে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'আমাকে ক্ষ্যাত বলা আপনার ঠিক হয়নি। ক্ষেত শব্দের অর্থ জানেন ? না জানলে আমার কাছ থেকে আজ জেনে নিন। ক্ষ্যাত মানে ফসলের জমি।'

এতক্ষণ মাথা নিচু করে ছিল। মাথা উঁচু করে এবার ডলারের মাথার চুল থেকে

পায়ের নখ পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে। তারপর বলে, 'বলব, আপনাকে আমি ক্ষ্যাতই বলব। কী করবেন আপনি ?'

এ প্রশ্নের উত্তরে ডলার কেন যেন হাসে ! ডলারের মুখে হাসি দেখে আরও ক্ষেপে যায়। ক্ষেপে গিয়ে আর দাঁড়ায় না। হন্‌হন্‌ করে লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে যায়।

ডায়মন্ড মামা এতক্ষণ অধীর আগ্রহে সব শুনছিলেন, আর মনে-প্রাণে গ্রাম থেকে আসা এই যুবকের প্রশংসা করছিলেন। এবার ছুটে এসে ডলারের পিঠ চাপড়ে বলেন, 'ব্রেভো, রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল ! ইয়াংম্যান, আমি সত্যি তোমার প্রশংসা না করে পারছি না।'

ডলার হেসে 'আমি এখন যাই ডায়মন্ড মামা' বলে নিজের জন্যে বরাদ্দ ঘরে এসে চেয়ার টেনে বসে।

দু'চোখ জুড়ে ঘুম আসছে। কিন্তু এসময় ঘুমানো ঠিক নয় ভেবে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনে লনে একটু হাঁটাহাঁটি করে।

হাঁটতে-হাঁটতে গেটের কাছে দারোয়ানের সামনে যেতেই দারোয়ান সালাম ঠুকে দাঁড়ায়।

'কেমন আছেন ?'

ডলারের প্রশ্নের উত্তরে দারোয়ান ভাল-মন্দ কিছু বলার আগেই পেছন থেকে রিংকি বলে, 'দারোয়ানকে আপনি করে বলছেন কেন ? ওকে তুমি বলবেন। এটাই এ বাড়ির রেওয়াজ।'

'ক্ষমা করবেন, এ রেওয়াজ আমি মানতে পারব না।'

'কেন পারবেন না ?'

'উনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। মুরুব্বী মানুষ। ওনাকে তুমি বলা ঠিক নয়।'

'সকল অফিসের বড় সাহেবরা এখন থেকে তাহলে বয়স্ক পিয়ন-চাপরাশিদেরও আপনি করে বলবেন, তাই না ?

'বললে ভাল হয়।'

'রাবিশ ! সিম্পলি রাবিশ !'

কথা বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না রিংকি ! হন্‌হন্‌ করে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। মনে-মনে ভাবে ডলার, ভোর বেলা ধাক্কা লাগা থেকে আরম্ভ করে মেয়েটার সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। কিন্তু কথা-বার্তা যা হয়েছে সব ঝগড়া-ঝাঁটির মতোই। এ কী মেয়েরে বাবা ! সব সময় যেন অগ্নিমূর্তি ধারণ করেই আছে !

দুপুরে ইচ্ছে করেই একটু দেরি করে খেতে যায়। কারণ, খাওয়ার সময় আর ঐ মাথা গরম মেয়েটার সামনে পড়তে চায় না। তাছাড়া এ বাড়িতে চাকর-বাকর ছাড়া সবাই কাঁটা চামচ ব্যবহার করে। সে কাঁটা চামচে খাওয়া তো দূরের কথা, কাঁটা চামচ ধরতেও শেখেনি।

দুপুরে খেয়ে এসে টানা দেড় দু'ঘণ্টার মতো ঘুমায়। ঘুম ভাঙে আয়ার ডাকাডাকিতে।

'আপনেরে সাবে বাড়ির সামনে লনে ডাকতাছেন।'

'যাও, আমি আসছি' বলে দ্রুত বাথরুমে ঢুকে চোখ-মুখে সামান্য জল দিয়ে মুখ মুছে লনে এসে দেখে, শোয়েব আখন্দ, রিংকি ও ডায়মন্ড মামা এক সঙ্গে বসে চা খাচ্ছেন।

'বসো বাবা।'

শোয়েব চাচা একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলেন।

ডলার জড়সড়ো হয়ে বসে।

'নাও, চা খাও।'

ডলার বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'আমি চা খাই না।'

ডলারের কথা শেষ হতে না হতেই কেউ কিছু বলার আগে ডায়মন্ড মামা বলেন, 'গুড, ভেরি গুড। আমি দিনে-রাতে মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট কাপ চা খাই, দিস ইজ ভেরি ব্যাড হ্যাবিট।'

শোয়েব আখন্দ শ্যালকের কথা শুনে মৃদু হেসে বলেন, 'নিজে দিন-রাত গোগ্রাসে চা গিলছ, আর বলছ চা খাওয়া খারাপ। সত্যি শ্যালক বাবাজী, তুমি একটা চিজ।'

ডায়মন্ড মামা দুলাভাইয়ের কথা শুনে ক্ষেপে যান। ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'এই ভাল ছেলেটা এ বাড়িতে এসে সকাল থেকে সব ভাল কথা বলছে। ভাবলাম আমিও একটা ভাল কথা বলি। কিন্তু আমি দুঃখিত দুলাভাই, আমি ভাল কথা বললেও আপনি দোষ ধরেন, খারাপ বললেও দোষ ধরেন।'

এ কথার উত্তরে শোয়েব আখন্দ কিছু বলার আগেই রিংকি হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা ড্যাডি, ইনি, আই মিন এই ডলার তোমার কে ?'

মেয়ের কথা শুনে শোয়েব আখন্দ মুচকি হেসে বলেন, 'আমি ওর চাচা।'

রিংকির কথা শোনার পর দুরু-দুরু বক্ষে কান পেতে থাকে। কিন্তু শোয়েব আখন্দের 'আমি ওর চাচা' কথাটা শোনার পরই খুশির নাগরদোলায় যেন দুলে ওঠে !

দেখে রিংকি গম্ভীর হয়ে মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছে।

অতি উৎসাহী ডায়মন্ড মামা এবার বলেন, 'দেখলি তো রিংকি, ছেলেটা কত সত্যবাদী। আর শোন, যাকে-তাকে যখন-তখন তোর ড্যাডির মতো সন্দেহ করার বাতিক এবার পিতা এবং কন্যা দু'জনেই ছাড়, বুঝেছিস ?'

কী ভেবে যেন এতক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকা রিংকি হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় এবং ধীরে-ধীরে বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

রিংকিকে এভাবে হঠাৎ চলে যেতে দেখে শোয়েব আখন্দ হেসে বলেন, 'বুঝলে ডলার, মেয়েটা কিন্তু আমার বেশ। দেখলে মনে হবে খুব কঠোর, কঠিন। আসলে কিন্তু তা নয়। একেবারে কাদা মাটির মতো নরম। ঠিক ওর মা'র মতো।'

ডায়মন্ড মামা শোয়েব আখন্দের কথা শেষ হতেই সগর্বে বুক চাপড়ে বলেন, 'ওর মা কার বোন, কোন বংশের মেয়ে সেটা দেখতে হবে না।'

শোয়েব আখন্দ যতই ভাল বলুক, রাতে খেতে বসে রিংকির সঙ্গে আবার ঠিকই টক্কর লেগে যায় ! সবার সঙ্গে আয়া খেতে ডাকলে আসতে চায়নি। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন আয়া গিয়ে শোয়েব আখন্দ ডাকছেন বলে, তখন আর না এসে পারেনি।

খেতে আরম্ভ করলেই রিংকি ফোঁড়ন কেটে বলে, 'ড্যাডি, এ বাড়ির কাস্টম কিন্তু কাঁটা চামচ ব্যবহার করা। কথাটা ওনাকে বলো।'

ডলারের হঠাৎ কী হয় কে জানে ! ছলাৎ করে বোধহয় মাথায় এক চিলতে রক্ত উঠে যায় ! অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বলে, 'আমি কাঁচা চামচে খাওয়া তো দূরের কথা, কী করে ধরতে হয় তাও জানি না। আমি মোমিনপুর গ্রাম থেকে এসেছি। আমি মাটির শানকিতে পচা-বাসি পান্তা খেয়ে এত বড় হয়েছি।'

ডলারের কথা শেষ হতেই শোয়েব আখন্দ দ্রুত বলেন, 'গ্রাম থেকে এসেছে, কাঁটা চামচের ব্যবহার কী করে জানবে, বল মা ?'

রিংকি কিন্তু থামে না। একই রকম বলে, 'কিন্তু এ বাড়িতে ড্যাডি–'

রিংকির মুখের কথা শেষ হয় না, শোয়েব আখন্দ দ্রুত বলেন, 'আমিও কিন্তু মা, এই মোমিনপুর গ্রাম থেকেই এসেছি। যখন ঢাকা আসি আমিও কিন্তু কাঁটা চামচ দেখিনি, ধরতেও জানতাম না। আমিও কিন্তু ওরই মতো মাটির শানকিতে কাঁচালঙ্কা দিয়ে পচা-বাসি পান্তা খেয়েই স্কুল-কলেজে গেছি।'

শোয়েব আখন্দের কথা শুনে ডলার অবাক হয়ে যায় ! এমন ধনী একজন মানুষ এ কথা বলতে পারে, কখনওই ধারণা ছিল না তার ! তাই বলে, 'আমি কিন্তু আপনার প্রশংসা না করে পারছি না চাচা।'

শোয়েব আখন্দ মুচকি হাসেন। হেসে বলেন, 'হঠাৎ প্রশংসা কেন ?'

'মানুষ আসলে নিজের লজ্জার বা কষ্টের অতীত ভুলে যেতে পারলেই বাঁচে। যে

সিঁড়িগুলি পেরিয়ে একজন মানুষ চারতলায় ওঠে, চারতলায় উঠেই পেরিয়ে আসা সিঁড়ির কথা সে ভুলে যায়। এটাই নিয়ম। আপনি মনে রেখেছেন।'

'বারে, সেটা আমার জীবনের অংশ নয় বুঝি ? বর্তমান এই সময়টাই আমার জীবনের অংশ ; আর শৈশব, কৈশোর, যৌবনের ফেলে আসা দিনগুলি আমার জীবনের অংশ নয়, অন্য কারও জীবনের অংশ বুঝি ?'

শোয়েব আখন্দের কথা শুনে অবাক হয়ে যায় ডলার ! আড়চোখে দেখে, রিংকি মাথা নিচু করে প্লেটে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কিন্তু কিছুই খাচ্ছে না।

খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে এসে এখন কী করবে ভাবে। এমনিতে ঘুমানোর আগে রোজ রাতে কমসে কম দেড় থেকে দু' ঘণ্টা বই পড়া চাই। বই পড়ার অভ্যাস আসলে ডলারের ছোট বেলা থেকেই। রূপকথার রাজা-রাণী, ভূত-পেত্নী, দৈত্য-দানবের গল্প দিয়ে শুরু। এখন রোজ রাতে ঘুমানোর আগে বইয়ে মুখ গুঁজে থাকা চাই-ই চাই।

এ সময় বারান্দা দিয়ে রিংকিকে হেঁটে যেতে দেখে দ্রুত গিয়ে বলে, 'আপনার কাছে পড়ার মতো ভাল কোনও বই আছে ?'

'শুধু একটা দু'টো বই নয়, পুরো একটা লাইব্রেরী আছে, বুঝেছেন ?'

রিংকির কথা ঠিক বুঝতে পারে না ডলার। তাই বলে, 'পুরো লাইব্রেরী মানে ?'

'এ বাড়ির দোতলায় বইয়ে ঠাসা, পুরো একটা লাইব্রেরী আছে।'

রিংকির কথা শুনে অতি আনন্দে ডলার বলে, 'সত্যি বলছেন আপনি ?'

'আপনার কি ধারণা দুনিয়ার একমাত্র সত্যবাদী আপনি ? ভুলচুক করেও এ পৃথিবীর অন্য কেউ আর সত্য কথা বলে না ? তবে হ্যাঁ, লাইব্রেরী আছে ঠিকই, তবে ভারি-ভারি জ্ঞানের বইয়ে ঠাসা। দর্শন আছে, বিজ্ঞান আছে, কঠিন সাহিত্য আছে, অঙ্ক আছে, ভূগোলের জ্ঞান আছে, অথচ সিনে-ম্যাগাজিন নেই। সুতরাং আপনার আর এই লাইব্রেরীতে অনর্থক অনুপ্রবেশ করে কাজ নেই।'

ডলার কিন্তু রিংকির খোঁচামারা কথা শুনেও কেন যেন ক্ষেপে যায় না। বরং হাসি মুখে বলে, 'আপনার কোনও আপত্তি না থাকলে আমি বরং লাইব্রেরীতে গিয়ে একটু পড়াশুনা করতে চাই।'

'এমনিতেই লাইব্রেরীটা জ্ঞানের ভারে ডুবতে বসেছে, আপনি গিয়ে আবার সেটাকে আরও ডুবাতে চান ?'

ডলার এবারও যে ক্ষেপে যায়, তা নয়। আগের মতোই হাসি-হাসি মুখ করে বলে, 'আমি তাহলে যাই, কী বলেন ?'

প্রশ্ন করে আর উত্তর শোনার জন্যেও অপেক্ষা করে না। পড়ি কী মরি করে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে লাইব্রেরীর দিকে এগোয়।

লাইব্রেরীতে ঢুকে তো আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাওয়ার অবস্থা ! এত বড় বিশাল একটা লাইব্রেরী একটা বাড়ির মধ্যে থাকতে পারে ভাবতেও পারেনি !

রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল সবই আছে। তবে সব চেয়ে বেশি আছে বোধহয় সাহিত্যের বই। তাও বিশ্বসাহিত্য নয়, বাংলা বই-ই বেশি। 'আলালের ঘরের দুলাল' যেমন আছে, হালের হুমায়ূন বা সুনীলের সর্বশেষ বইটিও বোধহয় আছে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে এক-একটা বই হাতে নেয় আর পাতার পর পাতা উল্টায়। বেশ ক'টা বই নাড়াচাড়া করে অবশেষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' টেনে নেয়।

মেধাবী ছাত্র ডলারের ভার্সিটিতে ভর্তি হতে কোনও বেগ পেতে হয় না। কিন্তু একটা জিনিস সারাক্ষণ কাঁটার মতো বেঁধে, এ বাড়িতে এভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে পড়ে থাকাটা কি ঠিক !

এভাবে পরের মুখাপেক্ষী হয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়ার কথা ভাবতেও পারে না সে।

আবার এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার অর্থই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানো। কে আশ্রয় দেবে তাকে ! তাছাড়া বিধবা মা'র পক্ষে যে আর একটা কানাকড়িও দেয়া সম্ভব নয়, এ কথাও জানে না, তাও নয়।

বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর মা অনেক কষ্টে এতদূর টেনে এনেছেন। অল্প-স্বল্প করে ধানি জমি হয় সবই বেচেছেন, নয়তো বন্ধক দিয়েছেন।

হঠাৎ মনে হয়, রোজ যে কোনও একটা সময় রিংকিকে পড়ালে কেমন হয় ? এতে এভাবে আশ্রিত হয়ে পড়ে থাকার লজ্জা কিছুটা হলেও অন্তত ঘুচবে।

কথাটা মনে ধরে যায়। হ্যাঁ, এতে কিছুটা হলেও সম্মানের সঙ্গে এ বাড়িতে থাকা যাবে। ব্যাস, ভাবতে-ভাবতেই উঠে দাঁড়ায় এবং সোজা রিংকির ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু ঘরের মধ্যে রিংকি আর এক বান্ধবীর কথা শুনে দরজার বাইরে থমকে দাঁড়ায়।

ভেতরে দু'জনের কথা স্পষ্ট শুনতে পায়।

'বুঝলি বন্যা, এমন ক্ষ্যাত আমি জীবনে দেখিনি। প্রথম দিন বাড়িতে ঢুকেই, সোফায় দু'পা তুলে বসে কটকট শব্দ করে মোয়া খাওয়া শুরু করেছে।'

বন্যা পাল্টা বলে, 'মোয়া কী রে রিংকি ?'

'এই সেরেছে, আমি জানি নাকি মোয়া জিনিসটা কী ! তবে খাওয়ার সময় কটকট

শব্দ হয়, এটা জানি।'

'হয়তো এটা ওর কোনও প্রিয় খাবার।'

'উসকো-খুসকো চুল, ব্যাকডেটেড ট্রাউজার, ময়লা একটা শার্ট পরে সোফায় পায়ের উপর পা তুলে বসে মোয়া চিবুচ্ছে ! সে কী দৃশ্য, তোকে যে কী বলব বন্যা !'

বন্যা কী ভেবে পাল্টা বলে, 'লোকটাকে নিয়ে এত রিসার্চ করছিস কেনরে তুই ? লোকটা দেখতে কেমন, বল তো ?'

'ধ্যাৎ ! লোক কী রে ! ছেলে ! আমাদের চেয়ে খুব বেশি হলে দু' তিন বছরের বোধহয় বড় হবে।'

বন্যা আবার বলে, 'দেখতে কেমন রে ?'

রিংকি হাসে। রিংকির হাসির শব্দ বাইরে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট শুনতে পায় ডলার। রিংকি হেসে বলে, 'তবে হ্যাঁ, লন্ড্রিতে পাঠিয়ে ভাল করে ধোলাই দিলে আর আপটুডেট ড্রেস পরালেই বেশ হ্যান্ডসামই মনে হবে।'

কথা বলতে-বলতে রিংকি হাসে। রিংকির কথা শুনে রিংকির সঙ্গে বন্যাও হাসে। এভাবে আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় ভেবে, সোজা ঘরে গিয়ে ঢোকে।

হাসাহাসির মধ্যে এভাবে হঠাৎ ডলারকে ঘরে ঢুকতে দেখে, দুজনেই হাসি থামিয়ে অবাক হয়ে তাকায় !

'ইয়ে, মানে, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা ছিল।'

ডলারের এভাবে হঠাৎ ঘরে ঢোকা এবং কথা বলা দেখে রিংকি অবাক হয়ে বলে, 'এখনই বলবেন ?'

ডলার হঠাৎ ভাবে, না, রিংকির বান্ধবীর সামনে এভাবে কথাটা বলা ঠিক হবে না। তাই বলে, 'ঠিক আছে, জরুরি মানে এত বেশি জরুরি নয়, পরে বললেও বোধহয় হবে।'

কথা বলে দাঁড়ায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার বাইরে গিয়ে শোনে, বন্যা বলছে, ' এই সেই চিড়িয়া, তাই না ? তা কী নাম বাছাধনের ?'

'জনাবের নাম মার্কিন মুদ্রা। আই মিন, ডলার।'

দুই বান্ধবীর তাকে নিয়ে হাসি-মস্করা শুনতে ভাল লাগে না। তাই আর আড়িপেতে না থেকে, সোজা এসে নিজের ঘরে ঢোকে।

নিজের ঘরে এসে পড়ার টেবিলে মন খারাপ করে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকে। বন্যা ও রিংকির কথা তার ভাল লাগেনি। ওরা তাকে গ্রাম থেকে সদ্য ঢাকায় আসা এক আনস্মার্ট গেঁয়ো ভূত ভেবেছে। অথচ শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি কোনও কিছুরই কমতি নেই তার, এ কথা সে নিজে বেশ ভালই জানে।

ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করে আবার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে রিংকির ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে রিংকি বিছানায় বসে ওয়াকম্যান কানে লাগিয়ে গানের তালে-তালে শরীর দোলাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে ডলার বলে, 'আমার কথাটা কি আমি এখন বলব ?'

কান থেকে ওয়াকম্যান খুলে রিংকি বলে, 'গান শুনছিলাম। মাইকেল জ্যাকসনের। তা, আপনি মাইকেল জ্যাকসনের নাম শুনেছেন ?'

ডলারের প্রিয় নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, দেশাত্ববোধক এসব। ইংরেজি গান যে দু-একটা শোনেনি, তা নয়। তবে বাংলা গান ছাড়া দুনিয়ার কোনও গানই তার ভাল লাগে না।

রিংকির প্রশ্নের উত্তরে তাই নেতিবাচক মাথা দোলায়।

'আপনাকে আমি যতই দেখছি, ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি ! আপনি এমনই এক বঙ্গ সন্তান যে বিশ্বখ্যাত পপ তারকা মাইকেল জ্যাকসনের নাম শোনেননি ! সত্যি ধন্য, ধন্য আপনি !'

রিংকির বলা প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য অন্তরে গিয়ে বেঁধে। তবু গায়ে না মেখে যথাসম্ভব সহজভাবে বলে, 'আমি ঠিক করেছি, এখন থেকে আমি আপনাকে পড়াব।'

ডলারের কথা শুনে রিংকি যেন আকাশ থেকে পড়ে ! অবাক হয়ে বলে, 'কী, বলছেন কী আপনি ! মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না ! আমাকে পড়াবেন, মানে ?'

'হ্যাঁ, আপনাকে এখন থেকে আমি রোজ সকালে বা সন্ধ্যায় অথবা অন্য কোনও সুবিধাজনক সময়ে পড়াব।'

রিংকি ডলারের কথা বুঝতে পারে না। তাই বলে,' বললেই হল, আমি না পড়লেও আপনি পড়াবেন ? হঠাৎ পড়াবেন, তার মানে কী ?'

'পড়াব মানে পড়াব। এর আবার এত মানে খোঁজার দরকার কী ! বেশ হবে কিন্তু ! আপনার মেধা আছে, বুদ্ধি আছে, মনে হয় স্মরণশক্তিও ভালই। আমার ছাত্রী হলে আগামীতে আর কোনও পরীক্ষায় আপনি খারাপ করবেন না, এটা আমি হলফ করে বলতে পারি।'

'আমি পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করি, কে বলেছে আপনাকে ? আমি 'ও' লেভেলে সাত সাবজেক্ট পরীক্ষা দিয়ে ছয় সাবজেক্টে 'এ' পেয়েছি, জানেন ? আপনার ধারণা আপনি ছাড়া এ দুনিয়ার কেউ ভাল রেজাল্ট করে না, তাই না ?'

ডলার রিংকির এভাবে হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়া দেখে দ্রুত বলে, 'আমি ঠিক ওভাবে কথাটা–'

ডলারের কথা শেষ হবার আগেই রিংকি বলে, 'শুনুন ডলার-পাউন্ড বা ইয়েন সাহেব, আমার সব সাবজেক্টে আলাদা-আলাদা প্রাইভেট টিউটর আছে। আপনার মতো মহাজ্ঞানী মহাজনের আর খামাখা মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

'দেখুন, আমি আপনাদের বাড়িতে থাকি, খাই। বলা চলে, আমি আপনাদের বাড়ির একজন আশ্রিতের মতোই। পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে কার ভাল লাগে, বলুন ?'

রিংকি অবাক হয়ে বলে, 'সে-জন্য আমাকে পড়াতে হবে ?'

'জ্বি। এতে অন্তত নিজেকে আর এ বাড়িতে একজন আশ্রিতের মতো অসহায় মনে হবে না। আপনি পড়বেন না আমার কাছে ? '

'এ বাড়ির মালিক নিজেই বলেছেন তিনি আপনার চাচা হন। আপনিই বা নিজেকে এত অসহায় ভাবছেন কেন ?'

'তবু এভাবে আপনাদের বাড়িতে আছি।'

রিংকির হঠাৎ কী হয় কে জানে ! রিংকি বলে, 'ঠিক আছে, আমি আপনার কাছে পড়ব, হল তো ?'

আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেও এত খুশি হত কি না কে জানে ! তাই বলে, 'আমি জানতাম, আপনি বড় ভাল মেয়ে।'

রিংকি না হেসে পারে না। ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে রিংকি বলে, 'আপনি জানেন, আমি ভাল মেয়ে !'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা আপনি খুব ভাল একটি মেয়ে। যতই উপরে-উপরে চোটপাট করেন না কেন, আমার মনে হয় আপনার মনটা আসলে খুব নরম।'

নিজের প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে ! তবু বলে 'থাক, নিজের চরকায় তেল দিন। আর অহেতুক প্রশংসা করে কাজ নেই।'

আসলে মোমিনপুর থেকে এসে এই বাড়িতে ঢোকার পর, এই প্রথম হাসিমুখে কথা বলে দু'জন। মনে-মনে ভাবে ডলার, এই রিংকিকেই কি এতদিন দেখেছে সে !

রিংকিও কেন যেন হঠাৎ একই রকম ভাবে, লোকটা বোধহয় খারাপ নয়।

কিন্তু খানিক পরেই এই হাসি-হাসি মুখ করে কথা বলা আর থাকে না। গণ্ডগোল হতে খুব যে সময় লাগে, তা নয়। পড়াতে এসে এবং পড়তে বসে, আবার অন্যান্য দিনের মতোই কথা কাটাকাটি করে দু'জন।

'শোনেন, পড়ানো শুরু করার আগে আপনাকে একটা কথা কিন্তু বলা দরকার। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রথম দিনেই বলে নেয়া ভাল।'

রিংকি বাধ্য ছাত্রীর মতো বলে, 'বেশ তো, বলুন ?'

ভনিতা নয়, ডলার সোজাসাপ্টা বলে, 'পড়াতে বসেছি, তার মানে আপনাকে শেখানো, এই তো ? তা, আপনার নামের যে কোনও অর্থ নেই, তা কি আপনি জানেন ?

রিংকি অবাক হয়ে বলে, 'অর্থ নেই মানে ?'

'অর্থ নেই মানে, অর্থ নেই। আমি বেশ কয়েকটা অভিধান ঘেঁটেছি। না, রিংকি শব্দের কোনও হদিশ পেলাম না।'

ডলারের কথা শেষ হতে না হতেই রিংকি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। রেগেমেগে বলে, 'আপনি এখন যান। আমার শরীর খারাপ, আমি এখন ঘুমাব।'

ডলার বুঝতে পারে তার সত্যি কথা রিংকির পছন্দ হয়নি। তাই বলে, 'আমি জানি, আপনি আমার ওপর আবার রাগ করেছেন। কিন্তু দেখুন, এই কথাটা না বললে অন্যায় হত যে, আপনি একটি অর্থহীন নামের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন।'

'আপনার কথা শুনতে যে আমার ভাল লাগছে না, তা কি আপনি বুঝতে পারছেন ?'

ডলার কী আর করে, চেয়ার ছেড়ে এক পা-দু'পা করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। দরজার কাছে গিয়ে বলে, 'কাল সকাল থেকেই তাহলে পড়াশোনা শুরু করি, কী বলেন ?'

'নো, নেভার। আমি আপনার কাছে কোনও দিন পড়ব না, আর কখনও পড়ব না, হল ?'

রিংকির কথা শুনে দরজার কাছে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় ডলার। কী যেন বলতে চায় ! কিন্তু কোনও কিছু বলার আগেই চোখে কালো চশমা পরা, 'কিস মি' লেখা গেঞ্জি গায়ে এক যুবক হুড়মুড় করে গায়ে এসে আছাড় খেয়ে পড়ে।

'কী হল, চোখ পকেটে রেখে চলাফেরা করেন নাকি ?'

যুবক নিজেই এসে গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আবার নিজেই এসব বলে। সঙ্গত কারণেই ডলার চুপ থাকতে পারে না। তাই বলে, 'আপনার চোখের ওপর রঙিন চশমা আছে। কিন্তু আমার চোখ খোলা। আমার খোলা চোখে ক্লিন দেখতে অসুবিধা হবার কথা নয়।'

যুবক যারপরনাই রেগে যায় এবং রেগে বলে, 'হোয়াট ডু ইউ মিন ?'

ডলার হাসে। মুচকি হেসে বলে, 'আমার মনে হয়, আমার মতো আপনিও বাঙ্গালি। আমি বাংলায় বলেছি। সুতরাং বুঝতে আপনার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।'

কথা বলে আর দাঁড়ায় না। হন্‌হন্‌ করে সোজা নিজের ঘরে এসে খানিকটা পড়াশোনা করবে বলে চেয়ার টেনে বসে। কিন্তু বই টেনে নিয়েও মনোযোগ দিতে পারে না।

একটি প্রশ্নই মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়, ছেলেটা কে ! এ বাড়িতে আসার পর গত কয়েক মাসে অনেকবার দেখেছে। বাড়ির সামনের লনে, লিভিংরুমে, ছাদে, এমন কী বেডরুমে বসেও ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলে দু'জন।

এলোমেলো ভাবনা-চিন্তার মধ্যে একটা প্রশ্ন কেবল হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, আর কিছু নয়, ওরা দু'জন শুধু বন্ধুই তো ! ওদের আরও কোনও সম্পর্ক আছে কী নেই– কথাটা ভাবতে গিয়ে বুকের মধ্যে কেন যেন একটা অচেনা কষ্টবোধ আছড়ে পড়ে !

হঠাৎ নিজের এই কষ্টলাগা টের পেয়ে নিজেই যেন হতবাক হয়ে যায় ! রিংকির এই যুবকের সঙ্গে যদি জানা-অজানা কোনও সম্পর্ক থেকেই থাকে, তাতে তার কী !

কথাটা মনের মধ্যে উঁকি দিতেই ভাবে, কোথায় সে আর কোথায় রিংকি ! কোথায় গ্রাম থেকে সদ্য মহানগরীতে আসা এ বাড়ির আশ্রিত এক যুবক, আর কোথায় রূপে-গুণে রাজকন্যার সমতুল্য এই রিংকি ! নিজের লাগামহীন চিন্তা-ভাবনা দেখে নিজেই মনে-মনে হাসে ডলার !

'সাব আপনেরে লিভিংরুমে ডাকতেছেন।'

ঠিক এ-সময় আয়া মর্জিনা বেগম এসে বলে।

'ঠিক আছে, তুমি যাও' বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে না।

দ্রুত লিভিংরুমে এসে দেখে শোয়েব আখন্দ ও ডায়মন্ড মামা মনোযোগ দিয়ে কী যেন বলছেন।

'ডলার এসো, বসো।'

ডলার শোয়েব আখন্দের ডাকে একটা খালি সোফায় বসে।

'আগামী পরশু রিংকির জন্মদিন। রিংকির জন্মদিন এবার ধুমধামে সেলিব্রেট করতে চাই, কী বলো ?'

শোয়েব আখন্দের কথার উত্তরে ডলার কিছু বলে না, কেবল মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

'হাজার খানেক লোকের একটা ডিনার থ্রো করতে চাই।'

একটা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে হাজার খানেক লোককে দাওয়াত করে খাওয়ানোর কথা ডলার ভাবতেও পারে না।

কিন্তু এরা ধনী, এদের হাল-চাল বোঝা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কী আর করে, একই রকম মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

'আমার স্বপ্ন বলো, জীবন বলো, ঐ একটি মাত্র সন্তান। জন্মদিনে চমকে দেয়ার মতো ওকে কিছু গিফট দিতে চাই। কী দেয়া যায় বলো তো ?'

'আপনার তো অনেক টাকা, তাই বলছিলাম পুরো রবীন্দ্র রচনাবলী দিলে কেমন হয় ?'

ডলারের কথা শুনে শোয়েব আখন্দ না হেসে পারেন না। হেসে বলেন, 'ডলার, আমার ধারণা ছিল, তুমি বুদ্ধিমান। কিন্তু এখন দেখছি–'

শোয়েব আখন্দের কথা শুনে ডলার আবার একই রকম বলে, 'আমি কি ভুল কিছু বলেছি, চাচা ?'

'আমি ভাবছি কোথায় একটা লেটেস্ট মডেলের কার কিংবা জিপ প্রেজেন্ট করব, আর তুমি কি না সস্তা–'

হঠাৎ কী হয় কে জানে ! শোয়েব আখন্দের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে, 'রবীন্দ্র রচনাবলীকে সস্তা বলা কি ঠিক চাচা ? তবে বইয়ের গায়ে লেখা দামের কথা বিবেচনা করলে, দাম অবশ্য খুব বেশি নয়।'

ডায়মন্ড মামা এতক্ষণ ধরে দু'জনের কথা মুখ গোমড়া করে শুনছিলেন। ডলারের কথা শুনে এবার চোখ-মুখ কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ! এতক্ষণ ঠায় বসেছিলেন, এবার নড়েচড়ে বসে বলেন, 'থ্যাংকস। মুখের উপর হক কথা বলার জন্যে তোমাকে মেনি-মেনি থ্যাংকস ডলার। লাসভেগাসে আমাদের এমন এক বাঙালি বন্ধু আছে। তোমার মতো এমন মুখের উপর হক কথা বলতে কাউকে ছাড়ে না বলে আমরা সবাই তাকে তার অরিজিনাল নাম বাদ দিয়ে, 'হক সাহেব' বলে ডাকি, বুঝলে ?'

শোয়েব আখন্দ স্বভাবতই বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তুমি আবার এসব কিসের মধ্যে কী বলছ ? তোমার মাথায় তো গোবর জাতীয় পদার্থ ছাড়া মগজ-ঘিলু কিছুই নেই। তাই এই বুদ্ধিমান ছেলেটাকে ডাকলাম, কিন্তু সেও তো–'

কথা শেষ হওয়ার আগেই, মুখ থেকে কথা টেনে নিয়ে ডায়মন্ড মামা বলেন, 'আমার একটা কথা শোনেন দুলাভাই, কিছু মনে করবেন না। এই যে আপনি আমার মাথার মধ্যে গরুর গু গোবরের মতো একটা নিকৃষ্টতম পদার্থ রয়েছে বললেন, এটা কি ঠিক হল ? যাক, মনে কিছু করবেন না দুলাভাই, জানা কথা বোকা মানুষ দুনিয়ার সবাইকেই বোকা ভাবে। আর শোনেন, নিজের মেয়েকে হাতি-ঘোড়া যা কিছু আপনি প্রেজেন্ট করতে চান, করেন। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ায় এতগুলো টাকা নষ্ট করার কি কোনও মানে হয়, বলেন ?'

শ্যালকের কথা শুনে শোয়েব আখন্দ এবার ক্ষেপেই যান ! ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'নিজের একমাত্র মেয়ের জন্মদিনে আমি কৃপণতা করব নাকি ?'

'কৃপণতা করতে চান না। গুড দুলাভাই, গুড। খরচ করতে চান, করবেন। তবে নাম্মা-দাম্মি ব্যবসায়ী, হোমড়া-চোমড়া আমলা এসব ধনী লোকগুলিকে খাওয়ানো কেন ? এই টাকা দিয়ে হাজার বিশেক গরিব লোককে পেট পুরে কাঙ্গালি ভোজ

খাইয়ে দিন। পেট পুরে ঢেকুর তুলে খেয়ে দোয়া করবে, সওয়াব হলেও হয়ে যেতে পারে।'

শোয়েব আখন্দ এবার সত্যি ক্ষেপে আগুন হয়ে যান ! রাগে গড়-গড় করতে-করতে বলেন, 'যাও তুমি। এখান থেকে তুমি চলে যাও। তোমার মতো গোবর মাথার লোকের সঙ্গে কোনও কথা বলা সম্ভব নয়। আমি কোথায় বুদ্ধিমান যুবক ডলারকে ডাকলাম পরামর্শ করব বলে, তুমি কিনা মাঝখানে ফ্যাচাং বাঁধিয়ে দিলে। সত্যি তোমার মতো বুদ্ধিহীন লোক আমি জীবনে দেখিনি।'

ডায়মন্ড মামা রাগ করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, শোয়েব আখন্দের দিকে তাকিয়ে, কী যেন বলতে চান ! কিন্তু বলেন না। কিছু না বলেই হন্‌হন্‌ করে লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে যান।

ডায়মন্ড মামা চলে যাওয়ার পর শোয়েব আখন্দেরও হঠাৎ কী হয় কে জানে ! তিনিও উঠে দাঁড়ান। দাঁড়িয়ে বলেন, 'আজ থাক, পরে কথা হবে।'

শোয়েব আখন্দ ও ডায়মন্ড মামা চলে যাবার পরও ডলার বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকে। ডায়মন্ড মামাকে নিয়ে ভাবে, শোয়েব আখন্দকে নিয়ে ভাবে। ডায়মন্ড মামা মানুষটাকে যত দেখে, তত ভাল লাগে। সত্যি, এমন চমৎকার একজন মানুষ এ জমানায় বিরল, এটা বুঝতে পারে।

রাতে ডিনারের পর নিজের ঘরে এসে ঢুকতেই আয়া মর্জিনা বেগম এসে 'লিভিংরুমে আপনেরে সাবে সেলাম দিছেন' বলে।

লিভিংরুমে এসে ঢুকতেই শোয়েব আখন্দ ইশারায় বসতে বলেন। ডলার একটা খালি সোফায় বসে। বসে বলে, 'আমাকে ডেকেছেন, চাচা ?'

'রিংকির জন্মদিনের দাওয়াতের কার্ডটা কেমন হয়েছে, দেখো তো ডলার ?'

হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিয়ে ডলার সত্যি মুগ্ধ হয়ে যায় ! এমন সুন্দর কার্ড সে আগে কখনও দেখেনি ! খুব দামি হবে, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

'কার্ডটা সত্যি খুব সুন্দর চাচা।'

ডলারের কথা শেষ হতে না হতেই হন্তদন্ত হয়ে ডায়মন্ড মামা এসে ঢোকেন। শোয়েব আখন্দ ডায়মন্ড মামাকে হঠাৎ এভাবে ঢুকতে দেখে বলেন, 'কী চাই ?'

ডায়মন্ড মামা একটা খালি সোফায় বসে বলেন, 'কী চাই মানে ? আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে দুলাভাই।'

'এখন আমার সময় হবে না। আমি এখন ডলারের সঙ্গে কথা বলে তারপর লন্ডন ও প্যারিসে ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলব।'

শোয়েব আখন্দের কথা শুনে যে দমে যান, তা নয়। বরং বলেন, 'আরে রাখেন দুলাভাই, আপনার বুজরুকি। আমার জরুরি কথা জরুরিভাবেই আপনাকে শুনতে হবে।'

'ইউ আর সিম্পলি এ্যাবসার্ড ! বেশ বলো, কী বলতে চাও, বলো ?'

'আমি তিন মাসের মধ্যে আবার লাসভেগাস চলে যাচ্ছি।'

'সে তো সারা জীবনই লাসভেগাস আর ঢাকা, ঢাকা আর লাসভেগাস করে বেড়ালে। এটা কোনও ব্যাপার হল ?'

'হ্যাঁ, এবার যাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমি যে আজও একটা বিয়ে করতে

পারি নাই, এটা অত্যন্ত মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার জন্যে। আমি তাই ঠিক করেছি, এবার লাসভেগাসের সমস্ত ব্যবসা গুটিয়ে বাংলাদেশে চলে আসব এবং এই বাংলার একটা স্নিগ্ধ-সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করে, বাংলাদেশের এই সবুজের মাঝে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।'

'পাগল-ছাগলের মতো কী বলছ এসব ? ওখানে তোমার কোটি-কোটি ডলারের ব্যবসা।'

'অবজেকশান দুলাভাই। রাগের মাথায় কিংবা হাসি-ঠাট্টা করে কখনও পাগল বলতে চান, আপত্তি থাকলেও কিছু বলব না। কিন্তু ছাগল বলবেন না। মানুষ মাথা খারাপ হয়ে পাগল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ছাগল হয় কখনও, বলেন ? আর শোনেন, আপনি আমাকে পাঁচ লাখ পিস্ ট্রাউজার পাঠিয়েছিলেন, মনে আছে ? সেগুলোর প্রত্যেক পিস্ দুই ইঞ্চি করে ছোট ছিল। আমি বিলম্বে হলেও এটা বেশ বুঝেছি, আপনি কাপড় চুরি করে ছোট ট্রাউজার বানিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন, আপনি এ কাজ করে আমাকে অপমান করেছেন। আমাদের দেশকে বিদেশিদের কাছে ছোট করেছেন। আপনি ব্যবসার জন্য, টাকার জন্য শুধু নিষ্ঠুর নন, আপনি মানুষও খুন করতে পারেন।'

শোয়েব আখন্দ বিরক্ত হয়ে বলেন, 'কী যা-তা বলছ ?'

'আমি ঠিকই বলছি, আমি লাসভেগাসে আপনার নামে এ্যাডভান্স কেস করে এসেছি।'

শোয়েব আখন্দ স্বভাবতই অবাক হয়ে বলেন, 'এ্যাডভান্স কেস, মানে ?'

'হ্যাঁ, আমাকে এত বোকা লোক ভাবা ঠিক হয়নি আপনার। আপনি টাকার জন্য আমাকে খুন করতে পারেন, এমন কেস ঠুকে রেখেছি, বুঝেছেন ? আপনার সঙ্গে পার্টনারশিপের ব্যবসায় আপনি আমাকে অনেক ঠকিয়েছেন।'

শোয়েব আখন্দ তার এই শ্যালককে চেনেন না, এমন নয়। এই রাগারাগি খুব বেশিক্ষণ থাকবে না, তিনি ভালই জানেন। বুঝতে পারেন, কোনও কারণে হয়তো ক্ষেপেছে এবং ক্ষেপে গিয়ে এসব বলছে। মুচকি হেসে শোয়েব আখন্দ তাই বলেন, 'ঠিক আছে, পার্টনারশিপের ব্যবসা এখন থেকে কোরো না। লাসভেগাসে তোমার নিজেরও তো ব্যবসা আছে অনেক।'

'সব বিক্রি করে দেব। বিক্রি করে হাসপাতাল বানাব। আমার আপার নামে প্রায় একশ' কোটি টাকার সম্পত্তি আছে। পঞ্চাশ কোটি পাবে রিংকি। আর বাকি সব আমি বিক্রি করে এতিমখানা বানিয়ে ঘুঘুর ডাক শোনার জন্যে গ্রামে চলে যাব, বুঝেছেন ?'

কথা শুনে শোয়েব আখন্দ একই রকম হাসেন। হেসে বলেন, 'তুমি আমার ভিটেয় ঘুঘু চড়িয়ে, ঘুঘুর ডাক শুনতে গ্রামে চলে যাবে ?'

ডায়মন্ড মামা উত্তেজনায় হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। দাঁড়িয়ে বলেন, 'হ্যাঁ যাব, যাবই তো। তবে তার আগে একটা কাণ্ড করব। বিয়ে করব। তবে, বউ হবে একদম বাংলার বধূ।'

শোয়েব আখন্দ বলেন, 'তা দিন-ক্ষণ কি সব ঠিকঠাক করা হয়ে গেছে ? বরযাত্রী যাচ্ছে ক'জন ?'

ডায়মন্ড মামা শোয়েব আখন্দের দিকে ভীষণ রেগে কটমট করে তাকান। তারপর বলেন, 'মস্করা করছেন, দুলাভাই ? কী আর বলব, বলতে দ্বিধা নেই, আপনার কথা শুনে আমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে। এত বয়স হল, চুলে পাক ধরেছে, কোথায় একটা বাংলার বধূ খুঁজে বের করবেন আমার জন্য। তা নয়, ঠাট্টা-মস্করা করছেন ! দুনিয়াতে আমার সব হয়েছে, কোনও দিনও একটা বিবাহ হয়নি। এই দুনিয়ায় আমার সব আছে, কিন্তু আমার একটা বউ নেই। এটা কী আমার কম দুঃখ, বলেন ?'

কথা শেষ করে রেগেমেগে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দরজার কাছে গিয়েও থমকে দাঁড়ান। আবার বলেন, 'বিয়ে করব, বরযাত্রীও যাবে অগণিত–অসংখ্য লোক। রিংকি ও ডলার তো যাবেই। তবে বরযাত্রীর তালিকায় একজনের নাম থাকবে না এবং বুঝতে পারছেন সেই হতভাগ্য মানব-সন্তান আর কেউ নয়, স্বয়ং আপনি।'

শোয়েব আখন্দ পাগলাটে শ্যালকের কথা শুনে ক্ষেপে তো যানই না, বরং কাছে এসে পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, 'তোমার এই গুরুত্বপূর্ণ বিয়েটা এতদিন হয়নি, আরও কয়েকটা দিন না হলেও তেমন কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আগামী পরশু সন্ধ্যায় এ বাড়িতে রিংকির জন্মদিনের উৎসব। তোমাকেই তো সব দেখতে হবে, নাকি ?'

হঠাৎ কী হয় কে জানে ! একদম ঠাণ্ডা হয়ে যান ! নরম গলায় বলেন, 'ওর এই দুনিয়ায় একমাত্র মামা বলতে এই আমি, সেকি আর আমি জানি না। তবে হ্যাঁ, আমার দিল সাফ, কথাও সাফ। আপনার ঐ বড়লোক খাওয়ানো আমার পছন্দ নয়। সে আমি বলে রাখলাম।'

'যদি হাজার বিশেক লোকের একটা কাঙ্গালি ভোজ করি, আবার বাড়িতেও একটা ধুমধামসে ডিনার থ্রো করি। কেমন হয়, বলো তো ?'

কথাটা শোনা মাত্রই চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং দ্রুত বলেন, 'ঠিক বলছেন দুলাভাই ?'

'ডিনার এবং কাঙ্গালি ভোজ, এক সঙ্গে দু'টো আয়োজন তো তোমার একার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। তাই তুমি দায়িত্ব নেবে ডিনারের, আর ডলারের উপর দায়িত্ব থাকবে কাঙ্গালি ভোজের।' শোয়েব আখন্দ হেসে বলেন।

'কাঙ্গাল মানুষকে কাঙ্গালি ভোজের দায়িত্ব দিলে বুঝি, ড্যাডি ?'

রিংকি কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং চুপচাপ তাদের কথা শুনছে তা কেউ জানে না। হঠাৎ কথা শুনে সবাই মাথা ঘুরিয়ে রিংকিকে দেখে।

শোয়েব আখন্দ মেয়ের কথায় সায় দেন, তা নয়। তিনি বলেন, 'ওকে কাঙ্গাল বলা ঠিক নয় মা। ওর সম্পর্কে তুই আসলে জানিস না। ওর বাবা আর আমি ছিলাম বন্ধু, ছোট বেলার বন্ধু। এক সাথে স্কুলে গেছি, এক সাথে স্কুল থেকে ফিরেছি। এক সাথে খেলেছি, সাঁতার কেটেছি। কলেজে পড়া দুই যুবক বন্ধু এক সঙ্গে যুদ্ধে গেছি।'

একটানা কথা বলে শোয়েব আখন্দ থামেন। বোধহয় খানিকটা দম নেন। তারপর বলেন, 'এই যুবক ডলারের বাবা না থাকলে একাত্তরেই খান সেনাদের হাতে আমি শেষ হয়ে যেতাম।'

শোয়েব আখন্দ আবার থামেন। শোয়েব আখন্দকে থামতে দেখে ডায়মন্ড মামার আর তর সয় না। তিনি দ্রুত বলেন, 'তাই নাকি ? থামলেন কেন ? বলেন দুলাভাই, বলেন ?'

শোয়েব আখন্দ আবার বলেন, 'যুদ্ধের সময় একটা ব্রিজ উড়িয়ে দিতে গিয়ে আমি হঠাৎ পাক সেনাদের দ্বারা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হয়ে যাই। আমার থ্রি নট থ্রির রসদও যায় ফুরিয়ে। এমন সময় জীবনের ঝুঁকি জেনেও ডলারের বাবা আমাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতে একটা প্রাণ বাঁচল ঠিকই, কিন্তু–'

কথা বলতে গিয়ে মনে হয় গলা ধরে আসে, আর বলতে পারেন না শোয়েব আখন্দ। থামতে দেখে ডায়মন্ড মামা আবার বলেন, 'কিন্তু বলে থেমে গেলেন কেন দুলাভাই ?'

অশ্রু ভারাক্রান্ত শোয়েব আখন্দ আবার বলেন, 'কিন্তু ডলারের বাবা আমাকে বাঁচাতে গিয়ে সেদিন নিজেকে স্রেফ আত্মাহুতি দিল। বন্ধু একে বলে কি না, ভাই একে বলে কি না, আমি জানি না। তবে ডলারের স্কুল শিক্ষক বাবা আমার ভাইয়ের চেয়ে বেশি ছিল, বন্ধুর চেয়েও বেশি ছিল।'

রিংকি আসলে এত ভেবে কথাটা বলেওনি। শোয়েব আখন্দকে হঠাৎ এত অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতে দেখে এবার বলে, 'এখন সেন্টিমেন্ট রাখো তো ড্যাডি। আগে বলো, জন্মদিনের কেকের অর্ডার দিয়েছ কি দাওনি, দিলে কোথায় দিয়েছ ?'

শোয়েব আখন্দ পকেট থেকে রুমাল বের করে দ্রুত চোখ মুছে বলেন, 'পঞ্চাশ কেজির একটা চকলেট ফ্লেভার কেকের অর্ডার হোটেল সোনারগাঁওতে দেয়া হয়ে গেছে মা। তোর জন্যে আমি লেটেস্ট মডেলের একটা কারও সেলস্ রুমে চুজ করে এসেছি। অনুষ্ঠানের দিন সন্ধ্যায় দোকান থেকে ডেলিভারি দিয়ে যাবে।'

হঠাৎ কী হয় কে জানে ! আবেগ-আপ্লুত রিংকি বলে, 'মামণি মারা যাবার পর এ বাড়িতে গত তিন বছর কোনও উৎসব-আনন্দ হয়নি। খুব আনন্দ হবে, মজা হবে, তাই না ড্যাডি ?'

রিংকির জন্মদিনে কে কতটা আনন্দ বা মজা পায় তা জানে না, তবে অনুষ্ঠান শেষে অনেক কষ্ট, অনেক ব্যথা নিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢোকে ডলার ! মানুষ-মানুষকে এতটা অপমান করতে পারে, অসম্মান করতে পারে, জানা ছিল না ডলারের ! এ মহানগরীর এক-একটা মানুষের চমৎকার সুন্দর চেহারার নীচে, কী বিভৎস হিংস্রতা লুকিয়ে থাকে, তা এই প্রথম জানে ডলার !

সারা দিন ধরে কাঙ্গালি ভোজের ধকল সহ্য করে সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরে আসে, সমস্ত বাড়ি-ঘর তখন হরেকরকমের আলোক মালায় সজ্জিত। গণ্যমান্য মেহমানরা ইতিমধ্যে একজন দু'জন করে আসতে শুরু করেছেন।

নিজের ঘরে ঢুকে প্রথমেই ভাবে, কাপড়-চোপড় কী পরা যায়। ভাল করেই জানে, এত বড় একটা অনুষ্ঠানে পরার মতো তেমন কাপড়-জামা তার নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে, একটা পায়জামা ও পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। খুব যে খারাপ লাগে, তা নয়। তবু জানে আজ আগত সমস্ত অতিথির মধ্যে তার পরিধেয় বস্ত্রই হবে সব চেয়ে দীনদশার। অতশত না ভেবে, মনে-মনে 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান' বলে সোজা বাড়ির সামনের লনে সাজানো প্যান্ডেলে গিয়ে দাঁড়ায়।

দেখে রাজকন্যার মতো সেজে রিংকি তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছে। 'কিস মি' গেঞ্জি গায়ে দেয়া ছেলেটাকেও দেখতে পায়। আজ গেঞ্জি পরে নয়, থ্রি পিস নেভি ব্লু স্যুট পরে এসেছে। বন্যা নামের উচ্ছল বান্ধবীকেও দেখতে পায় বন্ধুদের এই জটলার মধ্যে।

রিংকির হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়তেই ছুটে আসে। ছুটে এসে বলে, 'এটা কী ড্রেস পরেছেন আপনি ? ভাল কিছু পরে আসুন, যান।'

ডলার আমতা-আমতা করে বলে, 'এর চেয়ে ভাল কিছু আমার তো নেই।

কথাটা শুনে রিংকি হঠাৎ যেন ক্ষেপে যায় ! দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে, 'রাবিশ !' বলে কিন্তু আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। সোজা ঝলমলে পোশাক পরে আসা বন্ধুদের জটলার মধ্যে গিয়ে আবার এটা-ওটা বলে আর হাসে।

রিংকি হঠাৎ তার পোশাক পরা নিয়ে ভাবছে কেন ! প্রশ্নটা স্বভাবতই হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। তাহলে কি ...? ভাবতে গিয়েই ফিক্ করে হেসে ফেলে।

আরে ধ্যাৎ, কোথায় রাজকন্যা সমতুল্য রিংকি, আর কোথায় রাখাল বালকতুল্য এই নিজে ! নিজের আবোল-তাবোল ভাবনা-চিন্তায় নিজেই আর না হেসে পারে

না।

সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই আগত মেহমানদের পদচারণায় সাজানো প্যান্ডেল ভরে যায়।

উপচেপড়া অতিথিদের সামনে ইয়াবড় একটা কেক কেটে জন্মদিনের অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করে রিংকি। কেকের একটা ছোট্ট পিস্ শোয়েব আখন্দ রিংকির মুখে তুলে দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিপুল করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে সমস্ত প্যান্ডেল।

ডলার এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখে, হাসি মুখে ডায়মন্ড মামা বিরামহীন ছুটাছুটি করে সব কিছু তদারক করছেন।

সবাইকে ছোট-ছোট প্লেটে কেকের পিস্ দেয়া শুরু হয়। সঙ্গে কোক, ফান্টা, সেভেন আপ এসব। তবে কোমল পানীয়ের সঙ্গে হার্ড ড্রিংকসও যে নেই, তা নয়। যার যা অভিরুচি, তাকে তাই দেয়া হচ্ছে। বিয়ারের ক্যান থেকে আরম্ভ করে ব্লাক লেবেল, সিভাস রিগাল সবই একটা বড় টেবিলে সাজানো আছে ডলার দেখতে পায়।

ডায়মন্ড মামা স্বয়ং এসে একটা ছোট্ট প্লেটে এক টুকরো কেক ও একটা কোকের গ্লাস ডলারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে যান। এ সময় মাইকে গান গাওয়ার জন্য বন্যা রিংকির নাম ঘোষণা করে। রিংকি হাসি মুখে ছোট্ট সাজানো মঞ্চে এসে একটা জনপ্রিয় আধুনিক গান গেয়ে শোনায়। সমস্ত প্যান্ডেল আবার করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে।

করতালি থামতে না থামতেই 'কিস মি' লেখা গেঞ্জির, আজ নেভি ব্লু রঙের থ্রি পিস স্যুট পরে আসা যুবক মঞ্চে উঠে হঠাৎ 'এবার আপনাদের গান গেয়ে শোনাবেন বিখ্যাত গায়ক ডলার' বলে ঘোষণা করে বসে। ঘোষণায় কৌতুক করে আরও বলে, 'জ্বি না, মার্কিন কারেন্সি নয়, প্রকৃতপক্ষে রক্তে-মাংশের ডলারই এখন গান গেয়ে শোনাবেন।'

হতভম্ব ডায়মন্ড মামা ছুটে এসে বলেন, 'কী হল, তুমি গান গাইতে জানো নাকি ডলার ?'

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব ডলার কোনও মতে বলে, 'জ্বি না, মামা। আমি জীবনে কখনও গান গাইনি।'

উদ্বিগ্ন ডায়মন্ড মামা বলেন, 'বুঝেছি, তোমাকে এই ভরা মজলিশে সবার সামনে অপদস্ত করবে বলে ওরা এই কাজ করেছে। এখন কী হবে ডলার ?'

ডলার এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে ! তারপর মাথা নিচু করে ধীরে-ধীরে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর বলে, 'হঠাৎ আমার নাম ঘোষণা করে, এই সুন্দর সন্ধ্যায়, এই সুন্দর অনুষ্ঠান কেন এভাবে নষ্ট করা হল জানি না। আমি গান গাইতে পারি না।

আমার এ না পারার অক্ষমতা, আমার এ ব্যর্থতা, আপনারা আপামর গুণীজন নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন, সবিনয়ে এই আমার অনুরোধ।'

কথা শেষ করে মাথা নিচু করে ধীরে-ধীরে মঞ্চ থেকে নেমে আসে। চতুর্দিকে হাসির রোল ওঠে।

সেই 'কিস মি' যুবক মঞ্চে এসে আবার ঘোষণা করে, 'গান গাইতে জানেন না। আবার কী সুন্দর গলাবাজি করে বক্তৃতা ঝাড়ে দেখেন ! কে জানে, এই ডলার সাহেব আবার নেতা–ফেতা হয়ে, মন্ত্রী-টন্ত্রী না হয়ে যায় দেখেন।'

যুবকের কথা শুনে অনেকেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। অপমানের জ্বালায় ডলার মাথা নিচু করে প্যান্ডেলের এক কোণায় দাঁড়িয়ে থাকে।

কেউ না এলেও ডায়মন্ড মামা ঠিকই কাছে এগিয়ে আসেন। রাগে, দুঃখে, অভিমানে ডায়মন্ড মামা দাঁত কিড়বিড় করে বলেন, 'ঘরে চলো ডলার। এ অনুষ্ঠানে তোমার মতো নিরীহ একজন গরিব মানুষ না থাকলেও কিছু আসবে যাবে না।'

এত লাঞ্ছনা, এত অপমানের মধ্যে এই একটি মানুষের ভালবাসার কমতি নেই দেখে, দু'চোখ অজান্তেই ঝাপসা হয়ে ওঠে।

দু'জন মাথা নিচু করে ধীরে-ধীরে ডলারের ঘরে এসে ঢোকে।

ডায়মন্ড মামা অপমানের তীব্র জ্বালায় গড়গড় করেন, আর সমস্ত ঘর অনবরত পায়চারি করেন।

'বুঝলে ডলার, এই যে শহরের নামী-দামি হাজার খানেক নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো এখানে একত্রিত হয়েছেন, এরা লেখাপড়া করেননি, তা নয়। কিন্তু শিক্ষিত হয়েছেন কি না সন্দেহ আছে। না ডলার, না, শিক্ষার এমন নমুনা হতে পারে না।'

ডলার মুখ তুলে ডায়মন্ড মামাকে আপাদমস্তক একবার দেখে। ডায়মন্ড মামা উত্তেজনায় বোধহয় থরথর করে কাঁপছেন ! ঘন-ঘন পায়চারি করেন আর বলেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি আমি। ওরা স্কুল-কলেজে গেছে। লেখাপড়া করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হয়নি। শিক্ষা তো মানুষকে সভ্য করে, নাকি ? কিন্তু এটা কী ! এতগুলো মানুষের মধ্যে একটা মানুষও এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, টু-শব্দ পর্যন্ত করল না। এরা জন্তু নয়, জানোয়ার নয়, এরা নাকি মানুষ ! ছিঃ !'

রাগে, উত্তেজনায় একটানা কথা বলে ডায়মন্ড মামা থামেন। তারপর গড়গড় করতে-করতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। কোথায় যাচ্ছেন বুঝতে অসুবিধা হয় না ডলারের।

জন্মদিনের অনুষ্ঠানের প্যান্ডেলের ধারে কাছেও যাবেন না, এটা বুঝতে পারে। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় সটান হয়তো এখন শুয়েই পড়েছেন।

দেড় দু' ঘণ্টার মধ্যেই হুইস্কির গ্লাস হাতে কিছু মধ্য-বয়সী ও বৃদ্ধ মাতাল ধনী লোক ছাড়া যে যার মতো বাড়ি চলে যান। বাইরের কোলাহলও ধীরে-ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে।

এ বাড়ির এমন একটা উৎসবে এ বাড়ির দু'জন মানুষ অপমানের জ্বালায় নিজেদের রুমে মনমরা হয়ে পড়ে আছে, এত বড় বাড়িতে তা খবর রাখারও যেন কেউ নেই ! দু'টি মানুষ না খেয়ে উপোস আছে, নিজেদের ঘরে যার-যার বিছানায় আকণ্ঠ অপমানের জ্বালায় এপাশ-ওপাশ করছে, তা আনন্দ-উৎসবমুখর এ বাড়ির কারোরই যেন খবর রাখার কোনও ফুসরত নেই !

শোয়েব আখন্দের কিন্তু কোনও কিছুই আসলে দৃষ্টি এড়ায় না। রাতে আয়া মর্জিনা বেগম তাই ঘরে এসে বলে, 'সাব আপনেরে ডিনার করণের লাইগা ডাকতাছে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে রাত পৌনে এগারটা। ইচ্ছে থাক বা না থাক উঠতেই হয়।

ডাইনিং হলে এসে দেখে টেবিলে খাবার-দাবার সব থরে-থরে সাজানো। শোয়েব আখন্দ, ডায়মন্ড মামা ও রিংকি বসে আছে।

'বলেছি তো দুলাভাই, আমার ও ডলারের ক্ষিধে নেই, আমরা খাব না।'

ঢুকেই ডায়মন্ড মামার কথা শুনতে পায়। ঢুকতেই শোয়েব আখন্দ ইশারায় একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলেন। ডলার মাথা নিচু করে বসে।

'তোমার ক্ষিধে নেই বুঝলাম। কিন্তু ডলারের ক্ষিধে আছে কী নেই, এটা বলার তুমি কে ?'

শোয়েব আখন্দের কথা শেষ হতে না হতেই ডায়মন্ড মামা বলেন, 'ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন। আমি জানি, ওর ক্ষিদে নেই।'

শোয়েব আখন্দ এবার স্বভাবতই ডলারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী ডলার, তুমি খাবে না ?'

ডলার মাথা নিচু করে বলে, 'আপনি বললে, আমি খাব। গুরুজনকে অসম্মান করা আমার গরিব মা আমাকে শেখাননি।'

এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকা শোয়েব আখন্দের মুখ হঠাৎ যেন এক পশলা আলোর ঝলকানিতে ঝকমক করে ওঠে ! অনেকক্ষণ পর সমস্ত চোখ-মুখে যেন হাসি ছড়িয়ে যায়।

শোয়েব আখন্দ এবার হেসে বলেন, 'কী হে, তা কোথায় গেল দুইজনের যৌথ অনশন ধর্মঘট ? ভেঙে গেল তো ?'

'ও ভাল ছেলে। যাকে বলে, গুড বয়। বেয়াদব না, বুঝেছেন ? আপনার কথা অমান্য করেনি। কিন্তু আপনিই বা কেমন মানুষ দুলাভাই ! এমন ভাবে অপমান

করল, মুখে রা পর্যন্ত করলেন না আপনি ! আমার সাফ কথা, এতদিন ধরে আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল, তা আর বোধহয় রাখা যাচ্ছে না।'

কথা শেষ হতে না হতেই শোয়েব আখন্দ কিছু বলার আগেই ডলার একই রকম মাথা নিচু করে বলে, 'চাচা কিছু না বলে ভালই করেছেন। প্রতিবাদ করার অর্থ ছিল রিংকির জন্মদিনের এমন একটা সুন্দর অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাওয়া। আমি বলি, চুপচাপ মুখ বুজে থেকে চাচা ভালই করেছেন।'

ডলারের কথা শুনে ডায়মন্ড মামা বোধহয় যারপরনাই ক্ষেপে-টেপে যান ! ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'শোনো ডলার, আমি বলছি শোনো, এত বেশি ভাল কিন্তু ভাল নয়। দুনিয়ায় আমি ভাল মানুষ অনেক দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো এমন অসহ্য রকমের ভাল আর দেখিনি।'

ডায়মন্ড মামার এ কথার উত্তরে ডলার আর কিছু বলে না। শোয়েব আখন্দ এবার মেয়ের দিকে আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকান।

শোয়েব আখন্দ কিছু বলার আগেই রিংকি বলে, 'আই এ্যম স্যরি। আসলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ছিল আমার বার্থ ডেতে ওদের একটা ফান, ড্যাডি।'

রিংকির কথা শুনে ডায়মন্ড মামার পক্ষে আর বোধহয় চুপ থাকা সম্ভব হয় না। তিনি দ্রুত বলেন, 'হাজার মানুষের সামনে এভাবে একজনকে অপমান করা ফান নয়, রিংকি।'

শোয়েব আখন্দ এবার মেয়েকে বলেন, 'শোনো মামণি, আজ তোমার জন্মদিন। আজ তোমাকে কষ্ট দেব না। তবু বলছি, তোমার বন্ধুদের এ কাজটা ঠিক হয়নি মা। ঠিক আছে, আর কথা নয়। এসো এবার খাওয়া-দাওয়া শুরু করা যাক, কী বলো ?'

ডলারের সত্যি বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না। অবাক হয়ে ডলার বলে, 'আপনি এখনও সত্যি খাননি চাচা ?'

শোয়েব আখন্দ হেসে বলেন, 'এই অপদার্থ শ্যালকটাকে আর তোমাকে ফেলে খাই কী করে বলো ? শুধু আমি নই, রিংকিও এখনও খায়নি।'

নিজের অজান্তেই ডলার বোধহয় মুখ তুলে একবার রিংকির দিকে তাকায়। কিন্তু রিংকি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকায় রিংকির মনোভাব কিছুই বুঝতে পারে না।

কিন্তু এটা বুঝতে পারে, রিংকি এখনও খায়নি শুনে নিজের ভেতরে একটা অজানা-অচেনা খুশি যেন বেজে উঠেছে !

'সবাই খেলেও, আমি কিন্তু খাব না। এ আমার শেষ কথা।'

ডায়মন্ড মামার কথা শুনে মন খারাপ করে রিংকি বলে, 'তুমি কি চাও মামা, জন্মদিনে আমি না খেয়ে থাকি ?'

ডায়মন্ড মামা দ্রুত প্লেট টেনে নিয়ে বলেন, 'খাব না মানে ? অবশ্যই খাব। তুই এতক্ষণ বলছিস না বলেই তো খাচ্ছি না। এই আমি বিসমিল্লাহ্ করলাম।'

শোয়েব আখন্দ খেতে-খেতে বলেন, 'তুমি এ জীবনে কখনও রাগ করে না খেয়ে ছিলে, বলো ?'

ডায়মন্ড মামা বলেন, 'পারি না দুলাভাই, না খেয়ে থাকা খুব টাফ।' ডায়মন্ড মামার কথা শুনে সবাই হাসে।

ডলারও না হেসে আর পারে না।

এ বাড়িতে সবাই মিলে একসঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট ও ডিনার করা অনেক দিনের রেওয়াজ। তবে লাঞ্চের সময় শোয়েব আখন্দ অফিসে এবং এক-একজন একেক জায়গায় থাকে বলে লাঞ্চে একত্রিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই।

ডলার কিন্তু ইচ্ছে করেই কোনও দিন রেওয়াজ মোতাবেক একত্রে খেতে বসে না। কারণ, গ্রামের ছেলে সে। পেট ভরে না খেলে তার চলে না। কিন্তু এ বাড়িতে এরা সবাই সাহেব-সুবার মতো কাঁটা চামচের টুংটাং শব্দ তুলে যৎসামান্য খায় বললেই চলে।

শোয়েব আখন্দ ধনী মানুষ। ধনী মানুষের অসুখ-বিসুখ হয়। শোয়েব আখন্দেরও হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস দু'টোই আছে। তিনি তাই বাছ-বিচার করে অতি অল্পই খান। রিংকিরও ফিগার ঠিক রাখার দিকে মনোযোগ আছে, সেও তাই খুব কমই খায়।

তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একজন পেটুক অবশ্য এ বাড়িতে আছেন। তিনি ডায়মন্ড মামা। ডলার দেখেছে, কী সুন্দর পেটপুরে ডায়মন্ড মামা খান !

ডলার খাওয়া-দাওয়ার সময় সবাইকে এড়িয়ে চলতে চায় বলে, ইদানীং সবার সঙ্গে খেতে তাকে আর ডাকা হয় না।

কিন্তু শুক্রবার বন্ধের দিন লাঞ্চের সময় তার ডাক পড়ে। আয়া মর্জিনা বেগম 'সাবে আপনেরে খাইতে ডাকতাছেন' বলে ডেকে নিয়ে যায়।

সবার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে ঠিকই, কিন্তু খাওয়া হয় না। কারণ যে নেই, তা নয়। ডাল দিয়ে মেখে গোগ্রাসে খাওয়া তার অভ্যাস। কিন্তু এদের এই বড়লোকি হাল-চালের মধ্যে ওভাবে খাওয়া তো আর সম্ভব নয়।

'কী হল, তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না ?'

শোয়েব আখন্দের প্রশ্নের উত্তরে ডলার বলে, 'আমি আসলে ঠিক জুমার নামাজ পড়ে এসে খাই। এখন তো মাত্র বারোটা বাজে।'

কথা শুনে ডায়মন্ড মামার মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ! তিনি বলেন, 'একেবারে ফিক্সড টাইম ? গুড, ভেরি-গুড ! ঠিক আমাদের লাসভেগাসের মতো। তা ডলার, এতদিন আছ, তোমার এভরি ডে রুটিন কিন্তু জানা হল না।'

'আপনারা খাচ্ছেন। মা বলেছেন, খাবার সময় বেশি কথা না বলাই ভাল।'

ডলারের কথা শুনে ডায়মন্ড মামা কিছু বলার আগেই শোয়েব আখন্দ বলেন, 'ও যখন শুনতে চাচ্ছে, বলো ডলার। ওর বেশি কথা বলতে যেমন ভাল লাগে, শুনতেও ভাল লাগে।'

কথা শুনে ডায়মন্ড মামা বলেন, 'অবজেকশান দুলাভাই। আমি মিসিগান ইউনিভারসিটিতে ফিলোসফি পড়েছি। এ সহজ-সরল, সত্যবাদী যুবকের কাছ থেকে এমন কোনও তথ্য পেয়েও যেতে পারি, যা নতুন কোনও দর্শনের জন্ম দেবে।'

ডায়মন্ড মামার কথা শেষ হতেই শোয়েব আখন্দ বলেন, 'ডলার তোমার বলার মতো কিছু থাকলে বলো। নইলে নিস্তার নেই তোমার।'

ডলার স্বভাবতই বলে, 'আমার জীবন খুব সাদামাটা মামা। আমরা গরিব মানুষ। মা আর আমি। অভাব-অনটনের সংসার। এমন কী বলব, বলেন ?'

'আমার নাম হচ্ছে হীরা। ইংরেজিতে ডায়মন্ড। আর আমি ডায়মন্ড চিনব না, তা তো নয়। তুমি বলো ডলার ?'

'ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠি। এক গ্লাস চিরতার পানি খাই। এক ঘণ্টা যোগ ব্যায়াম করি। ছ'টায় পাঁচটা আটার রুটি, ডাল অথবা আলু ভাজি দিয়ে নাস্তা করি। দুপুর ঠিক দুইটায় ভাত, শাক, মাছ জুটলে মাছ, নইলে ডাল। রাত ন'টায় ভাত, তরকারি, মাছ থাকলে মাছ, এক গ্লাস গরম দুধ। রাত বারোটায় ঘুমাতে যাই।'

ডায়মন্ড মামা খুশি হয়ে বলেন, 'বাহ্, তুমি দেখছি ভেজিটেরিয়ান। তাই তো তোমার স্কিন এত মসৃণ, শরীর এমন হালকা-পাতলা, অথচ পেটানো গড়ন। কিন্তু রাত বারোটা থেকে চারটা পর্যন্ত মাত্র চারঘণ্টা ঘুমাও তুমি ? বাকি সময় কী করো ?'

'পড়ি। বই কেনার সামর্থ নেই। লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ি, লাইব্রেরী থেকে এনে পড়ি।'

ডলারের কথা শুনে ডায়মন্ড মামা খুব খুশি হয়েছেন বোঝা যায়। হাসি-হাসি মুখ করে বলেন, 'গুড। ভেরি গুড। তাহলে দাঁড়াল তুমি শরীর আর মন দু'টোকেই তাজা রেখেছ। তবে হ্যাঁ, এ কথা বলতেই হবে, আপনি জীবনে উল্লেখ করার মতো একটা ভাল কাজ করেছেন, দুলাভাই।'

কাঁটা চামচ দিয়ে এক পিস্ ফিস ফ্রাই মুখে তুলে শোয়েব আখন্দ বলেন, 'কী হল,

এ সবের মধ্যে আবার আমাকে টানাটানি কেন ?'

'আপনার একটা ভাল কাজের কথা বলছিলাম দুলাভাই। দোতলায় লাইব্রেরীটা করে আপনি সত্যি একটা কাজের মতো কাজ করেছেন। এখন ডলার তুমি যত পার পড়ো, আর পড়ো। তবে এ বাড়ির কেউ এই বিশাল জ্ঞান-ভান্ডারে ঢোকে বলে মনে হয় না। এ বাড়ির কর্তা-ব্যক্তির তো নিজেকে জাহির করার জন্যেই মূলত এই বিশাল কালেকশান। নিজে ভুলেও কখনও একটা বইও নেড়েচেড়ে দেখেছেন বলে মনে হয় না।'

ডায়মন্ড মামার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শোয়েব আখন্দ খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়ান। এক মুহূর্ত ডায়মন্ড মামার দিকে তাকিয়ে থেকে হন্-হন্ করে নিজের ঘরের দিকে চলে যান।

রিংকিরও হঠাৎ কী হয় কে জানে ! বলে, 'মামা, আমি কি একদিনও লাইব্রেরীতে যাইনি, বলো তুমি ? খুব বেশি গিয়েছি এ কথা যেমন ঠিক না, আবার লাইব্রেরীর চৌকাঠ একেবারে মাড়াইনি, এটাও ঠিক না।'

কথা বলে রিংকিও আর দাঁড়ায় না, চলে যায়।

ডলার রিংকিকে চলে যেতে দেখে বলে, 'মামা, রিংকিও বোধহয় রাগ করে চলে গেল।'

ডলারের কথা শুনে ডায়মন্ড মামা গম্ভীর হয়ে বলেন, 'বুঝলে ভায়া, সবই বুঝি। কিন্তু আজও মেয়েদের রাগ, অনুরাগ, বিরাগ এসব কিছুই বুঝি না। আমার চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেল। আমি এত বুঝি, এত বড় পণ্ডিত, এত বড় দার্শনিক আমি, আমাদের লাসভেগাসের লক্ষ-লক্ষ মানুষকে কথায়-জ্ঞানে উন্মাদ করে দিলাম। অথচ এই দুনিয়ায় একটা নারীর মনও বুঝতে পারলাম না।'

ডলার স্বভাবতই মজা পায়। মজা পেয়ে বলে, 'কেন মামা, লাসভেগাসের কোনও মেয়েই কি আপনাকে পছন্দ করেনি ?'

'না, করেনি। ইচ্ছে করলে আমি এতদিনে দু'শ বিয়ে করে ফেলতে পারতাম, কিন্তু করিনি। কেন করিনি, বলো তো ডলার ?'

ডলার নির্দ্বিধায় বলে, 'জানি না মামা।'

ডায়মন্ড মামা হেসে বলেন, 'কারণ একটাই। আমি বাংলার একটি স্নিগ্ধ-শ্যামল মুখের ছবি হৃদয়ে এঁকে রেখেছি।'

ডলার কৌতূহল নিবারণ না করতে পেরে বলে, 'মেয়েটি কে মামা ?'

'তা তো জানি না। আমার সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। তবে হ্যাঁ, আমি যে মেম সাহেব বিয়ে করব না, এটা তুমি ধরে নিতে পার ডলার। আর এবার যে একটা বঙ্গ ললনা আমি সত্যি-সত্যি বিয়ে করে ফেলছি, তাকি তুমি জানো ?'

বিয়ের কথা শুনে ডলার স্বভাবতই খুশি হয়। খুশি হয়ে বলে, 'পাত্রী কে মামা ? খুব সুন্দর নিশ্চয়ই ?'

ডায়মন্ড মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'এটাই তো সমস্যা। বিয়ে কোনও সমস্যা নয়। কিন্তু পাত্রী হচ্ছে সমস্যা।'

এ সময় আয়া মর্জিনা বেগম এসে ডাইনিংরুমে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে বলে, 'সাবে আপনেরে লিভিংরুমে ডাকতাছেন।'

ডলারের এমনিতেই খাওয়া শেষ। উঠে বেসিনে হাত ধুয়ে লিভিংরুমে এসে দেখে, শোয়েব আখন্দ ও রিংকি মুখোমুখি বসে কী যেন কথা বলছে।

ডলারকে দেখেই শোয়েব আখন্দ বলেন, 'বসো ডলার।'

ডলার বসে।

'শোনো ডলার, আমি তোমাকে একটা জরুরি কথা বলব বলে ডেকেছি। কিন্তু ঐ বকবক মাস্টারের জন্যে বলার ফুসরতই পেলাম না। আমি ঠিক করেছি, এবার ঈদে আমি গ্রামের বাড়ি যাব। আমার তো গ্রামে তেমন কিছু আর নেই। ভাবছি তোমাদের বাড়িতেই উঠব।'

ডলার চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে দ্রুত বলে, 'ঠিক বলছেন চাচা ? সত্যি যাবেন আপনি ?'

ডায়মন্ড মামা দরজায় দাঁড়িয়েই সব শুনতে পান। শুনেই অতি-উৎসাহের সঙ্গে বলেন, 'গুড, ভেরি গুড। দুলাভাই, এবার ঠিকই আমি ঘুঘুর ডাক শুনব, চড়ুই পাখির ছুটাছুটি দেখব, দোয়েল পাখি খুঁজে বেড়াব। বেশ হবে কিন্তু দুলাভাই।'

সকলের কথা শুনে রিংকিরও উৎসাহ যেন আর ধরে না। রিংকি বলে, 'আমিও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যাব ড্যাডি।'

রিংকির উৎসাহ দেখে ডলার এবার হাসি মুখে বলে, 'মোমিনপুর গ্রামে কিন্তু বিদ্যুৎ নেই, এয়ারকন্ডিশনার নেই, বাথরুমে বাথটাব নেই। টিভি, ভিসিআর, ডিশ এন্টেনা এসব কিচ্ছু নেই।'

ডলারের কথায় কিন্তু রিংকি দমে যায় না। একই রকম হাসি মুখে বলে, 'তবুও আমি যাব। আপনার আপত্তি আছে কি না বলেন ?'

রিংকির কথা শুনে ডলার হেসে বলে, 'আমরা গরিব মানুষ। আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবেন ? খাওয়া-দাওয়া, গোসল সব কিছুতে খুবই কষ্ট হবে আপনার।'

'না পারার কী আছে ? ওখানে তো মানুষই থাকে, নাকি ?'

রিংকির কথার ডলার কোনও প্রতি-উত্তর দেয়ার আগেই ডায়মন্ড মামা শোয়েব আখন্দের কাছের একটি সোফায় এসে বসেন। বসে বলেন, 'এবার গ্রামে গিয়ে

তেমন একটা মেয়ে কি খুঁজে পাওয়া যাবে না দুলাভাই ? আপনি কী বলেন ?'

শোয়েব আখন্দ হাসেন। হেসে বলেন, 'পেলে কী হবে ?'

ডায়মন্ড মামা চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলেন, 'কী বলেন দুলাভাই, পেলে কী হবে মানে ? পেলে ঠিকই ফাটাফাটি একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলব। ফট করে পায়জামা-আচকান পরে, পাগড়ি মাথায় দিয়ে, বিসমিল্লাহ্ বলে কবুল করে নেব।'

'তার মানে, কাকে কবুল করবে তুমি ?'

'মস্করা করছেন দুলাভাই ? আপনি আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন নিয়েও মস্করা করছেন ? একটা মাত্র জীবনে নিজের এই একটা মাত্র বিয়েই তো খাওয়া। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, নিজের জীবনের সেই একটা মাত্র বিয়েও আমি এ জীবনে দেখে যেতে পারলাম না, খেয়ে যেতে পারলাম না। আর আপনি আমার সেই জীবন-মরণের প্রশ্ন বিয়ে নিয়েও অনবরত হাসি-ঠাট্টা করে চলেছেন ?'

'তেমন মেয়ে, তেমন মেয়ে করে তো আইবুড়ো হয়ে গেছ। আজও কিন্তু একটা তেমন মেয়ে খুঁজে পেলে না। তেমন মেয়ে বলতে তুমি কেমন মেয়ে চাও, তা তুমি বোধহয় নিজেও ঠিক জানো বলে মনে হয় না।'

'তেমন মেয়ে মানে দুলাভাই, যাকে বলে একেবারে গাঁয়ের বধূ। যার বড়-বড় দু'টি কাজল কালো টানা-টানা চোখ। যে টকটকে লাল আলতা পায়ে, নূপুর পরে, গাঁয়ের আঁকা-বাঁকা মেঠোপথ ধরে কলসি কাঁখে কাছের নদীতে জলকে যায়।'

ডায়মন্ড মামার কথা শুনে উচ্ছ্বসিত রিংকি হাততালি দিয়ে বলে, 'মারভেলাস মামা, মারভেলাস ! কলসি কাঁখের এমনই একটা মামী আমি চাই ।'

মেয়ের কথা শুনে শোয়েব আখন্দ হেসে বলেন, 'আমেরিকার লাসভেগাসে তোমার ডায়মন্ড মামার বউ কলসি কাঁখে নিয়ে নদীতে পানি আনতে যাবে, না ? শোনো শ্যালক বাবাজী, তোমার বিয়ে এ জীবনে আর হবে-টবে বলে আমার মনে হয় না। তোমার সেই তেমন মেয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না, বিয়েও আর হবে না। এই নিয়ে তিয়াত্তরবার তোমার বিয়ে ফাইনালে উঠেছে। আবার ক্যানসেল হয়েছে। বিয়ে এত চাট্টিখানি কথা নয়, প্রথমে রাউন্ড রবিন লীগ, তারপর কোয়ার্টার ফাইনাল, তারপর সেমি ফাইনাল, তারপরই হল গিয়ে ফাইনাল। সেই ফাইনালে পৌঁছা এত সোজা নয়, বুঝেছ ?'

ডায়মন্ড মামা কথা শেষ হওয়া মাত্রই উঠে দাঁড়ান। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, রাগত চোখে শোয়েব আখন্দের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বুঝিনি আবার ! স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, আপনি আমার জীবনের স্বপ্ন-সাধ সব ভেস্তে দিতে চান। আপনি নির্মম, আপনি নিষ্ঠুর ! আমার বিয়েটাকে আপনি সিলি ফুটবল খেলার সঙ্গে তুলনা করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। স্যরি দুলাভাই, আই এ্যম স্যরি।'

কথা বলে আর দাঁড়ান না। হন্-হন্ করে লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে যান। ডায়মণ্ড মামার রাগ করে এভাবে চলে যাওয়া দেখে সবাই হাসে।

ডলার এ-সময় হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'আপনারা সবাই তো যাচ্ছেন। আমি কি মাকে তাহলে একটা চিঠি লিখে দেব, চাচা ?'

শোয়েব আখন্দ দ্রুত বলেন, 'চিঠি লিখে জানাতে চাও ? ঠিক আছে, লিখে দাও ?'

ডলার আবার বলে, 'কবে নাগাদ আপনারা যাবেন লিখব ?'

'লিখে দাও, সাতাশে রোজার আগের দিন দুপুরে আমরা পৌঁছাব।'

রিংকির আনন্দ যেন আর ধরে না। রিংকি বলে, 'খুব মজা হবে। তাই না ড্যাডি ?'

রিংকির এ আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে ডলার অবাক হয়ে যায় ! কেন রিংকি তাদের বাড়ি যাওয়ার জন্যে এত উতলা হল ?

সে কি কেবল গ্রাম, গ্রামের দিগন্ত ছোঁয়া প্রকৃতি, সবুজ, এসব দেখবে বলেই ? নাকি অন্য কিছু ? সেই অন্য কিছুটা কী ? তবে কি ...?

ভাবতে গিয়েই বুকের মধ্যে যেন কেঁপে-কেঁপে ওঠে ! না, তার হাত এত লম্বা নয় যে, ইচ্ছে করলেই অনেক দূরের আকাশ স্পর্শ করতে পারে। না, এ মিথ্যে স্বপ্ন, এ আলীক স্বপ্ন দেখতে চায় না সে।

ডলার রিংকির গ্রামে যাবার আগ্রহ দেখে স্বভাবতই খুশি হয়। তবু বলে, 'আপনার গ্রামে যাবার আগ্রহ দেখে, আমি সত্যি অবাক না হয়ে পারছি না। আপনি জানেন না, গ্রাম কত কষ্টের, কত দুঃখের, আপনি জানেন না গ্রাম হচ্ছে অনাহার-অনটন।'

ডলারের কথা শুনে রিংকি প্রতিবাদ করে বলে, 'গ্রাম থেকে এসে গ্রাম সম্পর্কেই এসব বলছেন ? কিন্তু কই, গ্রামের প্রকৃতির কথা, সবুজের কথা, সৌন্দর্যের কথা তো কিছু বলছেন না ?'

ডলার কিন্তু থামে না। একই রকম বলে, 'কবিতার মতো গ্রামকে নিয়ে ভাবা যায়, দেখেই মুগ্ধ হওয়া যায়। কিন্তু এই সব হাজারো গ্রামের যে কত দুঃখ, কত কান্না, তা কেউ জানে না। খবরও রাখে না কেউ।'

শোয়েব আখন্দ এতক্ষণ ডলার ও রিংকির কথা শুনছিলেন। এবার বলেন, 'তোমার সঙ্গে আমি কিন্তু এক মত হতে পারলাম না ডলার। যত দুঃখই থাক, যত কষ্টই থাক, গ্রামের জীবন আর শহুরে জীবনের মধ্যে এখনও অনেক তফাৎ।'

শোয়েব আখন্দের কথা বোধহয় মনে ধরে যায়। ডলার তাই দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ, শহরের মতো গ্রামের জীবন এখনও এত মেকী নয় চাচা। গ্রামের যে সারল্য তা

এখানে কোথায় ? গ্রামের জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রেও এখন অভিশাপের মতো মিথ্যে ঢুকে গেছে ঠিক। তবে গ্রাম থেকে এখনও সবটা সত্য বোধহয় নির্বাসিত হয়নি।'

ডলারের কথায় রিংকি হাসে। হেসে বলে, 'সেই সত্য, সবুজ এবং সুন্দর দেখতেই আমরা গ্রামে যাব। কী বলো ড্যাডি ?'

রিংকির কথা শুনে শোয়েব আখন্দ আর কিছু বলেন না। কেবল হেসে ইতিবাচক মাথা দোলান।

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শোয়েব আখন্দের কিন্তু গ্রামে যাওয়া হয় না।

গ্রামে যাওয়ার জন্য সব ব্যবস্থা যখন ঠিকঠাক, তখনই রিংকির হঠাৎ জ্বর হয় ! প্রথমে জ্বরের প্রকোপ অবশ্য খুব বেশি ছিল না। পরে তা ভীষণ বেড়ে যায়। বেশ ক'দিন ধরে জ্বর আর নামে না। নিচে একশ' থেকে উপরে একশ' চার-পাঁচ পর্যন্ত টেমপারেচার অনবরত ওঠা-নামা করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য সব ফেলে শোয়েব আখন্দ মেয়ের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েন। এমনিতে খুব বেশি ধূমপান করেন না। কিন্তু একমাত্র মেয়ের অসুস্থতার কারণে চেইন-স্মোকারের মতো একটার পর একটা বেনসন টেনে ছাই করেন, আর সমস্ত ঘর অস্থিরচিত্তে পায়চারি করেন।

ডায়মন্ড মামাও খাওয়া-ঘুম সব ছেড়ে-ছুঁড়ে একই রকম রিংকির শিয়রে রাত-দিন বসে থাকেন।

জ্বর নামছে না দেখে, হাউজ ফিজিশিয়ান ডাক্তার সামাদ রক্ত পরীক্ষা করে জানান, টাইফয়েড।

বাড়ির সবার মতো ডলারেরও স্বভাবতই মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। মন খারাপ করে রিংকির ঘরে বারে-বারে অসুস্থ রিংকিকে দেখতে যায়। ডায়মন্ড মামার পেছনে নিশ্চুপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিজের রুমে ফিরে আসে। খুব খারাপ লাগছে, তা বুঝতে পারে। কিন্তু কেন এমন লাগছে, বুঝতে পারে না ডলার !

বিকেল বেলা বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে আকাশ-পাতাল কত কী ভাবে ! ডায়মন্ড মামা এ সময় তাকে দেখেই এগিয়ে আসেন। এসে বলেন, 'ডলার শোনো, তোমাকে একটা কথা কিন্তু বলা দরকার। গত ক'দিন ধরে কথাটা তোমাকে বলব–বলব করেও বলা হয়নি।'

ডলার ডায়মন্ড মামার কথায় কিছু বলে না। কী বলেন তা শোনার জন্যে উদগ্রীব

হয়ে ডায়মন্ড মামার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডায়মন্ড মামা বলেন, 'রিংকি জ্বরের ঘোরে কত কী বলছে জানো ? বেশির ভাগ সময় ডলার-ডলার বলে কী যেন সব বলছে।'

হতবাক হয়ে যায় ডলার ! কী বলছেন এসব ডায়মন্ড মামা ! এও কি সম্ভব ! নাহ্, আর ভাবতে পারে না ডলার !

'মেয়েটা বড় ভালরে ডলার। উপরে যতই চোটপাট করুক, রাগ দেখাক না কেন, মনটা বড় ভাল। এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। তুমি ডলার, ওকে দোয়া করো, তুমি খাস দিলে ওকে একটু দোয়া করো, যেন তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।'

ডলার কী বলবে না বলবে তা শোনার মতো ফুসরত কই ! একটানা কথা বলে আর দাঁড়ান না। দ্রুত চলে যান। হয়তো অসুস্থ রিংকির রুমের দিকেই যান।

কিন্তু যে কথা বলে যান, তা শোনার পর থেকেই কেমন যেন লাগে ! কী যেন এক অচেনা খুশি বহতা প্রতি ফোঁটা রক্তের মধ্যে যেন ছড়িয়ে যায় !

রিংকির সঙ্গে তার বিশাল ব্যবধান, সে ব্যবধান আসমান-জমিন সমান, তা যে সে জানে না, তা তো নয়। রিংকিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাটা তার জন্যে বিলাসিতা, সে বিলাসিতা তাকে মানায় না, এটা সে বেশ ভাল জানে।

রিংকিকে নিয়ে ভাবা ঠিক নয়, এ অসম্ভব ভাবনা ভাবার অধিকার তার নেই। এটা জেনেও ডায়মন্ড মামার কাছ থেকে কথাটা শোনার পর, কী এক অদৃশ্য সুতোর টানে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় !

নিজের অজান্তেই এক পা, দু'পা করে অসুস্থ রিংকির ঘরে গিয়ে ঢোকে। দেখে, রুমে আর কেউ নেই, বিছানায় শায়িতা রিংকি চোখ বুজে আছে।

জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে, দেখে বুঝতে পারে না।

একদৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে, খেয়াল নেই ! হঠাৎ জ্বরের ঘোরের মধ্যে রিংকির বলা কথা শুনে চমকে তাকায় !

'ডলার, এই ডলার, তোমাদের মোমিনপুর গ্রামে এত সুন্দর নদী আছে, আগে বলোনি কেন আমাকে? চলো, আমাকে নদী দেখাতে নিয়ে যাবে, চলো। কী, হল কী তোমার ? চলো না, জলদি চলো। আমি নদী দেখব, নদীতে নৌকা দেখব। সারি-সারি সব পালতোলা নৌকা, তাই না ডলার ? নদীতে মাছরাঙা পাখিরা, বক পাখিরা কী করে ছোঁ মেরে নদী থেকে ঠোঁটে মাছ তুলে নেয়, আমাকে কিন্তু তুমি দেখিয়ে দিও, কেমন ? আচ্ছা, আমি তো কখনও নৌকায় উঠিনি, নৌকায় উঠে পড়ে যাব না তো ? নৌকায় আমরা দু'জন কিন্তু অনেক দূর ভেসে যাব। সন্ধ্যার আগে ফিরব না, এ আমার সাফ কথা। সারাদিন কী খাব, তাই তো ? আরে আমার খাওয়া নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না সাহেব। অমন একদিন না খেলে আমার কিচ্ছু হয় না, বুঝেছ ?'

একটানা বিড়বিড় করে বলে বিছানায় দু'-একবার এপাশ-ওপাশ করে রিংকি। চোখ বুজে আছে। তাই ঘুমিয়ে আছে, নাকি জেগে আছে, বুঝতে পারে না।

কোনো দিন তুই বা তুমি করেও বলেনি। জ্বরের মধ্যেই আজ শুধু তুমি করে বলছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব ডলার রিংকির মুখের দিকে কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ডলার নিজেও বুঝতে পারে না, এত ভাল লাগছে কেন, এত ভাল লাগছে কেন রিংকিকে !

বুকের মধ্যে, বহতা রক্তের মধ্যে এক সুখের ঝড়, সুখের টালমাটাল বৈশাখি এক ঝড় যেন বয়ে যায় ! যে কেবল ঝগড়াই করেছে, কখনও ভুলেও মিষ্টি হেসে কথা বলেনি, সে আজ জ্বরের মধ্যে তুমি করে, এত আপন করে বলছে কেন !

প্রশ্নটা মনের কোণে উঁকি দিতেই, ভয়ে আর ভাললাগায় শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে যায় ! এ কী ভাবছে সে ! একটা অজানা ভয়ে, অজানা আশংকায় যেন কেঁপে-কেঁপে ওঠে !

রিংকির কণ্ঠ শুনে আবার কান খাড়া করে। স্পষ্ট শুনতে পায় রিংকি কী বলছে।

একটু খানি নড়েচড়ে স্থির হয়ে একই রকম চোখ বুজে বিড়বিড় করে বলে, 'এই, হাঁটতে-হাঁটতে প্রাণ যে আমার যায়-যায়। এসো, এই বটগাছের তলে বসে দু'জন খানিক জিরিয়েনি। আচ্ছা ডলার, এই নিরিবিলিতে একটা কথা বলব, তুমি কি কখনও কাউকে ভাল-টাল বেসেছ ? আরে ধ্যাৎ, ব্যাটা ছেলে হয়েও মেয়ে মানুষের মতো এমন লজ্জা পাচ্ছ কেন ? সত্যি, বিচিত্র একটা ছেলে তুমি ডলার ! তোমার মতো হ্যাদারাম, সত্যি আমি জীবনে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, তোমার মতো স্কলার, ভাল ছেলেকে ভালবাসার জন্যে দুনিয়ায় মেয়ের অভাব হবে না, এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। হাসছ কেন ? এই, তুমি হাসছ যে ? ভাল ছেলেকে ভাল বলব না তো কী বলব, তুমি বলো ? বলব, তোমাকে আমি হাজারবার ভালই বলব। ভাল ! ভাল ! ভাল ! হল ?'

সমস্ত পৃথিবীটাই যেন এক নিমিষে চোখের সামনে দুলে ওঠে ডলারের ! এ কী শুনছে সে ! এ কী বলছে রিংকি !

হঠাৎ আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেও, এত খুশি হত কি না কে জানে ! কেমন যেন লাগে ! একটা অজানা সুখ ! একটা চির অচেনা আনন্দের অনুভূতি ! হৃদয়ের ভেতরে অসংখ্য সুখপাখি যেন ডানা ঝাপটায়, অসংখ্য দোয়েল, কোকিল আর বউ কথা কও পাখি যেন ডেকে ওঠে !

আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। রিংকির ঘর থেকে বেরিয়ে তাই নিজের ঘরে এসে ঢোকে। ঘরে এসেও অনবরত-অবিরাম ভাবে। ম্যারাথন ভাবনা-চিন্তার পরও একটা প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই খুঁজে পায় না। জ্বরের ঘোরে রিংকি তুমি

করে, এত আপন করে বলল কেন !

রাতে খাবার টেবিলে বসে ঠিকই। প্লেটে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করেই আবার নিজের রুমে ফিরে আসে।

কিছুই খাওয়া হয় না।

খানিকটা পড়বে বলে চেয়ার টেনে বসেও, পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না। রাতে ঘুমিয়েও সেই একই কাণ্ড!

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে। দারুণ সেজে-গুজে তার বিছানার পাশে এসে বসে, হাসি-হাসি মুখ করে রিংকি বলে, 'তুমি আমাকে ভালবেসে ফেলেছ, তাই না ডলার ? না, আমি বলছি, ভালবাসা অপরাধ নয়। তাছাড়া, কেনই বা তুমি এত ভয় পাবে ? কী নেই তোমার ? তুমি স্কলার, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, মিথ্যাচার মুক্ত এক যুবক। তোমার বাবাও এমনই বীর, যিনি বুক পেতে দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন আমাদের স্বাধীনতার জন্যে। বিশ্বাস করো তুমি, আমাকে ভালবাসার সকল যোগ্যতাই তোমার আছে। হ্যাঁ, আমি বলছি, এই দুনিয়ায় একমাত্র তুমি ছাড়া আমাকে ভালবাসার অধিকার আর কারও নেই।'

ঘুম ভেঙে যায়। তাই স্বপ্নও আর থাকে না।

বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালে। দেখে রাত পৌনে তিনটা বাজে।

কী ভেবে স্যুটকেস থেকে বাঁশিটা বের করে নিয়ে ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর বাঁশিতে ফুঁ দেয়। অনেক দিন পর 'সখি, ভালবাসা কারে কয়' রবীন্দ্র সঙ্গীতটা বাজায়।

'আপনি এত সুন্দর বাঁশি বাজান !'

বাঁশির সুর শুনে কখন রিংকি ছাদে এসেছে, পেছনের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এক মনে বাঁশি শুনেছে, জানে না।

এত রাতে অসুস্থ শরীরে রিংকিকে ছাদে দেখে স্বভাবতই চমকে ওঠে ডলার !

'আপনার শরীর খারাপ। আপনি ছাদে কেন এলেন ?'

'সন্ধ্যার পর থেকে জ্বর নেই। এখন টেমপারেচার নরমালই বলা যায়। ভাবলাম, কে এমন সুন্দর বাঁশি বাজায় ! যাই, দেখে আসি !'

'তবু এত রাতে আপনার এভাবে, এ শরীরে আসা উচিত হয়নি।'

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করব, উত্তর দেবেন আপনি ?'

রিংকির এ কথা শুনে বলে, 'বেশ তো, বলুন ?'

'আমার জন্মদিনে গান না গেয়ে, বাঁশি বাজালেও তো পারতেন ! কী, পারতেন না ? কেন ছুটে গিয়ে ঘর থেকে বাঁশি এনে সবার সামনে বুক টান-টান করে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজালেন না, বলুন ?'

ছাদের আবছা আলো-আঁধারিতে কেউ-কাউকে স্পষ্ট দেখতে পায় না। তবু ডলার মুখ তুলে রিংকির দিকে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'আমাকে নিয়ে আপনি এবং আপনার বন্ধুরা যে মজার খেলা খেলেছিলেন, তাহলে সে খেলার মজা একেবারে নষ্ট হয়ে যেত না, বলেন ? নিজের জন্মদিনে কোনও কারণে আপনি কষ্ট পান, এটা আমি চাইনি।'

'আপনি না সত্যবাদী ?'

'আমি মিথ্যে বলিনি। আমি বাঁশি বাজাতে পারি। গান জানি না।'

হঠাৎ কী হয় কে জানে ! ভীষণ ক্ষেপে যায় রিংকি ! অসুস্থ শরীরে ক্ষেপে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে ! কাঁপতে-কাঁপতে বলে, 'আপনি কী ! আপনি কী, বলুন তো ? আমার জন্মদিনের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে বলে, আপনি মাথা নিচু করে এতসব সহ্য করলেন ! সত্যি, বিচিত্র এক মানুষ আপনি ! জানেন, এখন আপনাকে আমার কী করতে ইচ্ছে করছে ?'

রিংকির প্রশ্নের উত্তরে ডলার বলে, 'জানি না।'

'না, মায়া-মমতা নয়। বিশ্বাস করুন, আপনাকে অনুকম্পা করতে, দয়া করতে ইচ্ছে করছে আমার। আপনি হয়তো এ কথা জানেন না, বন্ধুরা যে আমার জন্মদিনে এমন করবে, আমি তা আসলে আগে জানতাম না। এত বিদ্যা-বুদ্ধি আপনার, এত বোঝেন, অথচ একটা মেয়ের মন বুঝতে পারেন না। সত্যি কী, কী আপনি !'

কথা বলে আর দাঁড়ায় না। ছাদ থেকে সোজা নিজের ঘরে এসে ঢোকে।

এরপর বেশ কিছু দিন একই বাড়িতে, একই ছাদের নীচে থেকেও আর দেখা হয় না। রিংকি নয়, ইচ্ছে থাকার পরও ডলারই যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। তবে দেখা হয় না, তা নয়।

কয়েক দিন যেতে না যেতেই একদিন বিকেল বেলা তার রুমে বসে কী যেন পড়ছিল। এ-সময় রিংকি এসে হাজির। এসেই বলে, 'কী হল, একেবারে হাওয়া হয়ে গেছেন ! কোনও টু শব্দ নেই, পিন্ ড্রপ সাইলেন্ট ! শুনুন, কোনও ওজর-আপত্তি করে লাভ নেই। আপনাকে নিয়ে সাভার স্মৃতিসৌধে বেড়াতে যাব, চলেন। জলদি চলেন, কুইক।'

রিংকির কথা শুনে রক্তের মধ্যে একটা টালমাটাল ঝড়ো নাচন অনুভব করে, মন-প্রাণ সব যেন আনন্দে নেচে ওঠে ! ভিতরে-ভিতরে এত খুশি হয়েও মুখে কিন্তু কিছু বলে না।

সাভার স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত যায়। রিংকি নিজেই ড্রাইভ করে।

স্মৃতিসৌধে এর আগে একা আরও একবার এসেছে ডলার। জাতীয় স্মৃতিসৌধে এলেই মনটা যেন কেমন হয়ে যায় তার !

স্মৃতিসৌধের পাদদেশে বসে এটা-ওটা কত কী কথা বলে ! খুব বেশিক্ষণ যে থাকে, তা নয়।

সন্ধ্যা হওয়ার আগেই আবার ফিরে আসে।

এরপরও আরও দু'একদিন এখানে-ওখানে ঘুরতে-বেড়াতে যায়। অনর্গল কথা বলতে-বলতে কখন দু'জন 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামে, তা দু'জনের কেউ-ই টের পায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় শোয়েব আখন্দের ঘরে হঠাৎ ডাক পড়ে ডলারের। এসে দেখে শোয়েব আখন্দ, রিংকি ও ডায়মন্ড মামা বসে আছেন।

শোয়েব আখন্দ ইশারায় বসতে বলেন।

ডলার বসে।

শোয়েব আখন্দ বলেন, 'এ মাসের পঁচিশ তারিখ সন্ধ্যায় বাড়ির লনে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে ডলার। অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হওয়া চাই। হাজার দুই লোক ডিনার করবেন।'

ডলার কৌতূহল দমন না করতে পেরে বলে, 'কী অনুষ্ঠান চাচা ?'

শোয়েব আখন্দ কিছু বলার আগেই দেখে, রিংকি হাসি মুখে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

শোয়েব আখন্দ চলে যাওয়া রিংকির দিকে তাকিয়ে, একগাল হেসে বলেন, 'আমি আমার এই দুষ্টু মেয়ের বিয়ের ঘোষণা দেব, বুঝেছ ডলার ? আমারই এক বন্ধুর ছেলে। নাম ইকবাল। এবার আমেরিকা থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে মাস্টারস করে এসেছে সে। বিরাট ধনী। ওরা দু'জন দু'জনকে দেখেছে।'

মাথার উপর খান্‌খান্ করে সমস্ত আকাশটা যেন ভেঙে পড়ে ! সমস্ত পৃথিবীটাই যেন নিমিষে চোখের সামনে হঠাৎ জমাট কালো অন্ধকার হয়ে যায় ! স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া এমন কষ্টের, না, আগে তা জানা ছিল না ডলারের !

'আমি তাহলে এখন আসি চাচা' বলে, এক পা-দু'পা করে ধীরে-ধীরে নিজের রুমে এসে ঢোকে। বুঝতে পারে, হঠাৎ এক অন্তর্ভেদী কষ্ট রক্তের শিরা-উপশিরায় যেন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে !

ঠিক এসময় এক পা-দু'পা করে ধীরে-ধীরে রিংকি এসে ঢোকে। ডলারের খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, 'আমার বিয়ের কথা শুনে তুমি খুশি হয়েছ, ডলার ?'

রিংকির এ প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে বুঝতে পারে না। মাথা তুলে কেন যেন রিংকিকে একবার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। কে জানে অপার আনন্দে চোখ-মুখ বোধহয় ঝলমল-ঝলমল করছে !

ইচ্ছায়, কী অনিচ্ছায় জানে না, রিংকির প্রশ্নে অজান্তেই মাথা নেড়ে সম্মতি

জানায়।

ডলারে মাথা নেড়ে সম্মতি জানানো দেখে, রিংকি এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'তুমি মিথ্যের বেসাতি জানো না, করোও না, এটা জানি। তবু মন বলছিল–'

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ কেন যেন থেমে যায় ! কী যেন বলতে গিয়েও বলে না।

রিংকির হঠাৎ এভাবে থেমে যাওয়া দেখে, মাথা নিচু করে ডলার বলে, 'থেমে গেলে যে ? কী বলছিলে, বলবে না রিংকি ?

'না, থাক।'

কী যেন বলতে গিয়েও বলে না। আর দাঁড়ায়ও না। ধীরে-ধীরে ডলারের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কেন এসেছে রিংকি ! কী বলতে চেয়েছিল। বলতে গিয়েও কেনই বা থেমে যায় ! আবার এভাবে চলেই বা গেল কেন ! বুঝতে পারে না ডলার।

রিংকি চলে যাওয়ার পরও পাথরের মতো ঠায় বসে থাকে। কষ্ট, অসহ্যরকমের এক কষ্ট রক্তের প্রতি বিন্দুতে যেন ছড়িয়ে পড়ে !

মনে পড়ে না, জীবনে কখনও, কোনও দিন একফোঁটা চোখের জলও ফেলেছে। প্রতিনিয়ত অভাব-অনটনের সঙ্গে বাস করা ছাড়া, জীবনে তেমন কোনও শোক-দুঃখের মুখোমুখি হয়নি। হলেও একফোঁটা জল ফেলেছে বলে মনে পড়ে না।

কিন্তু কী হয় কে যে জানে ! আজ কেন যেন চোখ ফেটে কান্না আসে !

কেন যেন ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে !

নিজেই বুঝতে পারে না, কেন কাঁদছে ! কেন এ কষ্ট !

গত কয়েক দিন মধ্যরাতে চোরের মতো চুপি-চুপি এসে বাকি রাতটুকু কাটানো ছাড়া, বনানীর এ বাড়িতে থাকাই হয়নি বলা যায়।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে সামান্য কিছু নাকে-মুখে দিয়েই বেরিয়ে যায়। ফেরে সেই রাতে। রাত মানে, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর, মধ্যরাতে।

কেন এভাবে পালিয়ে বেড়ায়, তা নিজেও জানে না ! কেন যায়, কোথায় যায়, কী করে, নিজেও বুঝতে পারে না !

আর যাই হোক, রিংকি একটি মেয়ে। তার চোখ এড়ায় না কিছুই। একটা মানুষ সকালে হাওয়া হয়ে যায়। ফিরতে-ফিরতে মাঝরাত। চোখে পড়বে না, তা কী করে হয় !

সকালে তাই ব্রেকফাস্টের টেবিলে ডলারকে পেয়ে বলে, 'কী হয়েছে তোমার ?'

হঠাৎ এ প্রশ্নে কী বলবে ঠিক বুঝতে পারে না। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাই এদিক-ওদিক তাকায় ডলার।

রিংকি দেখে ডলার কিছু বলছে না। নিশ্চুপ থাকতে দেখে আবার বলে, 'কী হয়েছে বলবে না ?'

কী আর করে, বাধ্য হয়েই বলে, 'কী আবার হবে ? কই না তো, কিছু হয়নি তো।'

কথা বলেই উঠে দাঁড়ায়। আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করে না।

ব্রেকফাস্ট অসমাপ্ত রেখে এভাবে চলে যেতে দেখে, রিংকি মুখ তুলে অবাক হয়ে তাকায়।

আসলে কী হয়েছে, কেন এমন করছে, তা নিজেও জানে না ! প্রশ্নটা নিয়ে কেন যেন নিজে-নিজেই নাড়াচাড়া করে। এই যে দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দেবদাস সেজে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো, তা কেন !

তাহলে কি রিংকিকে নিয়ে নিজের অজান্তেই স্বপ্ন দেখছে ! নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেও উত্তর পায় না।

অলীক জেনেও, দুঃস্বপ্ন জেনেও, কেন দেখল এ স্বপ্ন !

আজও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীন ঘুরে বেড়ায়। দুপুরে এসে গুলশান পার্কে ঢুকে একাকী নির্জন লেকের পাশে গিয়ে বসে। লোকের শান্ত জলে, নীল হয়ে নিজের ছায়া পড়ে। নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে এলোমেলো কত কী ভাবতে-ভাবতেই দুপুর গড়িয়ে গুলশান পার্কের সবুজ গাছ-গাছালিতে ধীরে-ধীরে বিকেল নামে।

ক্ষিধেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। দূরে হেঁটে যাওয়া একটা ঝালমুড়িওয়ালা ডেকে এক ঠোঙ্গা ঝালমুড়ি নেয়। নির্জন লেকের পাশে বসে ঝালমুড়ি চিবুতে-চিবুতেই লেকের নীল জলে সন্ধ্যা নামে।

হঠাৎ অনতিদূরে কার যেন চিৎকার শুনে ভীষণ চমকে ওঠে ! 'বাঁচাও-বাঁচাও' বলে কে যেন চিৎকার করছে ! এদিক-ওদিক তাকায়।

কে চিৎকার করে, কোথা থেকে এ আর্তচিৎকার ভেসে আসছে, কিছুই বুঝতে পারে না।

তবে কণ্ঠস্বর শুনে এটা বুঝতে পারে, এ চিৎকার কোনও মেয়ের।

নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ায়। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কোনও কিছু না ভেবেই নারী কণ্ঠের আর্তনাদ লক্ষ্য করে দ্রুত পা ফেলে এগুতে থাকে।

কাছাকাছি পৌঁছে একদম হতভম্ব হয়ে যায় !

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে খানিক নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ! কী করবে কিছুই বুঝতে পারে না !

সমস্ত আকাশ মাথার উপর ভেঙে পড়লেও এতটা বিস্মিত হত কি না কে জানে !

হতভম্ব হয়ে দেখে, রিংকিকে ঘিরে চারটা তাগড়া জোয়ান ছেলে জটলা করে দাঁড়িয়ে রিংকির ওড়না ধরে, হাত ধরে টানাটানি করছে। ওদের কারও হাতে শাণিত ক্ষুর, কারও হাতে ধারালো ছোরা, কারও হাতে কিরিচ ! রিংকি উৎকণ্ঠায়, আতংকে থরথর করে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। প্রাণপণে 'বাঁচাও-বাঁচাও' আর্তচিৎকার করছে, আর অবিরাম চোখের জল ফেলে চলেছে। বুঝতে পারে না, রিংকি হঠাৎ এই পার্কে কেনই বা এসেছে !

জিন্স শার্ট, কালো চশমা পরা, বিশ্রীরকম দেখতে একটা ছেলে রিংকির ওড়না নিয়ে টানাটানি করতে-করতে বলে, 'একজনের লগে বইসা কেবল ফুসুর-ফাসুর মহব্বত করলে চলব ক্যান ? এই যে দেখ সুন্দরী, তোমার পেয়ারের কাঙাল, মহব্বতের ফকির তাগড়া মতোন চারটা জোয়ানরে চক্ষু জুড়াইয়া দেখ। চল যাই বিশ্বসুন্দরী, আজ রাইতখান একটু ইশক করি, মহব্বত করি।'

রিংকি একটা মাস্তান মতো ছেলের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলে, 'প্লিজ, ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। তোমাদের পা ধরি, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও ভাই তোমরা।'

বাজখাঁই গলার এতক্ষণ চুপ করে থাকা একজন বলে, 'ভাই ! কিসের ভাই ! আমরা তোর কিসের ভাই রে ! করতে চাই পেয়ার, সে বলে ভাই ! এক নাগরের লগে এই এতক্ষণ যে বইসা মহব্বত করলি, হেইটাতে কোনও দোষ নাই ? আর আমরা একটু মহব্বত করতে চাইলেই দোষ, না ?'

রিংকি কাঁদে। কেঁদে বলে, 'ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। একটু কথা বলব বলে এসেছিলাম। পা ধরি, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আমার এই গলার চেইন, হাতের ঘড়ি, হীরের আংটি, সব নিয়ে যাও তোমরা। তবু আমাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর দোহাই লাগে, ছেড়ে দাও আমাকে।'

একটা মাস্তান হিঃ হিঃ করে হেসে বলে, 'আরে, ঐগুলা নিব না ক্যান ? ঐগুলা এহন তো আমাগোই সম্পত্তি। তয় সুন্দরী, তোমার লগেও কিন্তুক একটু পিরিত করুম, হ, করুমই করুম। আইজ রাতখান শুধু একটু পিরিত হইব। কাইল ফজরে ভদ্রলোকের মাইয়া সোজা ভদ্রলোকের মাইয়ার মতন ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়া ঢুকবা, বুঝছ ?'

ডলার আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সোজা ওদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়।

'কী চাস তুই ?'

'ওকে ছেড়ে দাও তোমরা।'

ডলারের কথা শুনে হুংকার ছেড়ে এক মাস্তান বলে, 'কে রে তুই শালা ? ভাগ এইখান থেইকা। কী চাস, ক ? হিন্দী ফিলিমের নায়কের লাহান কেরামতি দেখাইতে চাস ? শালা ! যা ভাগ।'

কোথা থেকে এ চিৎকার আসে, কী করে এত জোরে চিৎকার করে, বুঝতে পারে না ! চিৎকার করে ডলার বলে, 'ওকে ছেড়ে দে বলছি।'

'ও বুঝছি, বুইঝা গেছি। মরবি বইলা একেবারে মনস্থির কইরা আসছস। তার মাইনে হইল, এই দুনিয়ায় তোর দানা-পানি খতম, রিজিক শেষ। হায়রে, তোর মরণ আল্লাহপাক আমাদের হাতেই তা হইলে লেইখা রাখছে।'

আর দেরি করে না। উপর্যুপরি ছুরি, ক্ষুর, আর কিরিচ দিয়ে মাস্তানরা একটার পর একটা আঘাত করে। ডলার কিন্তু এত আঘাতেও হেলে না, এতটুকু নড়ে না।

বুক টান-টান করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'এই কুত্তার জন্যই সবই লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল দেখছি। এমন একটা লাল গোলাপ ফুল শুঁইকাও দেখতে পারলাম না।'

মাস্তানরা কী আর করে, কথা বলতে-বলতে গলার চেইন, ঘড়ি ও আংটি নিয়ে ছুটে চলে যায়।

মাস্তানরা চলে যাওয়ার পর দূরে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা ইকবাল ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসে। এগিয়ে এসে বলে, 'কেমন আছ রিংকি ? ভাল আছ তো ? ইস্, কিছু হয়নি তো রিংকি তোমার ?'

উদ্বিগ্ন রিংকি দ্রুত বলে, 'এসো, ওকে ক্লিনিকে নিয়ে যেতে হবে, এসো।'

রক্তাক্ত ডলারকে দু'জনে ধরাধরি করে গুলশানের একটা ক্লিনিকে এনে তোলে। বুকে, হাতে, পায়ে, বেশ ক'টা কোপ লেগেছে।

এত রক্ত দেখে রিংকি স্বভাবতই ভীষণ ঘাবড়ে যায়। অত্যধিক রক্তপাতে ডলার গাড়িতেই জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ে।

জ্ঞান ফিরতে অবশ্য সময় লাগে না।

তবে সুস্থ হতে বেশ সময় লাগে।

রিংকি সকাল-বিকেল কমসে-কম অন্তত দু'বার ডলারকে দেখতে ক্লিনিকে আসে।

শোয়েব আখন্দও দু'একদিন পর-পর আসেন। ডায়মন্ড মামার তো রাত-দিন নেই, পারলে সব সময় আসেন, পারলে পড়েই থাকেন ক্লিনিকে।

রোজ ক্যালেন্ডারের তারিখ দেখে ডলার।

আজ পঁচিশ তারিখ। জানে, আজ সন্ধ্যায় সুন্দর এক অনুষ্ঠানে রিংকির বিয়ের ঘোষণা হবে।

ইকবাল সাহেবকে দেখেছে। বেশ হ্যাণ্ডসাম। মনে-মনে ভাবে, সত্যি খুব মানাবে দু'জনকে।

আজকের এ অনুষ্ঠানের সব আয়োজন তারই করার কথা ছিল। কী জানি, শেষ-মেষ ডায়মন্ড মামাই সব ব্যবস্থা করেছেন বোধহয়।

এসময় একটা নীল শাড়িতে চমৎকার সেজে রিংকি এসে ঢোকে। হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

রিংকি হেসে বলে, 'কেমন আছ ?'

ডলারও হাসে। হেসে বলে, 'ভাল। তুমি ভাল আছ, রিংকি ?'

ডলারের প্রশ্নের উত্তরে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'আজকে কত তারিখ, মনে আছে তোমার ?'

ডলার কিছু বলে না। কেবল ইতিবাচক মাথা নাড়ে।

রিংকি আবার বলে, 'আজ বিকেলে তোমার মা আসছেন আমাদের বাড়িতে, জানো ?'

ডলার দ্রুত বলে, 'আমার মা ? কী বলছ তুমি ? হঠাৎ আমার মা কেন আসছেন ?'

'বারে, আজকের এ অনুষ্ঠানে আমাকে দোয়া করবেন না ?'

ডলার রিংকির কথা-বার্তা কিছুই বুঝতে পারে না। বোঝার কথাও নয়। আবার সেই অলীক স্বপ্নটা, আবার সেই দুঃস্বপ্নটা রঙে রঙিন হয়ে হানা দেয়। না, এ মিথ্যে, এ ভুল, আর সে ভাবতে চায় না।

'তুমি কী বলছ রিংকি, আমি বুঝতে পারছি না।'

রিংকি দুষ্টুমির হাসি হাসে। ঠোঁটে এক টুকরো দুষ্টুমির মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বলে, 'প্যারিস নয়, লন্ডন নয়, দিল্লীও নয়, হানিমুনে কোথায় যাওয়া যায়, বলো তো ? আমার ইচ্ছে মোমিনপুর। বারে, নদী দেখতে হবে না, নদীতে নৌকা দেখতে হবে না ?'

আর্বার সেই স্বপ্ন মনের মধ্যে উঁকি দেয়। না, এ মিথ্যে স্বপ্ন দেখবে না ডলার। তাই বলে, 'তুমি কী বলছ রিংকি ?'

রিংকি হঠাৎ কেন যেন এবার প্রাণখুলে খিলখিল করে হাসে। খানিক প্রাণখুলে হেসে বলে, 'হ্যাঁ, আজকে বাড়িতে অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানে আমার বিয়ের ঘোষণাও হবে। তবে আমি কোনও কাপুরুষকে নয়, একজন পুরুষকেই বিয়ে করব।'

হতচকিত ডলার মুখ তুলে রিংকির হাসি-খুশি সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এত সুন্দর লাগছে কেন ! রিংকিকে কেন এত সুন্দর লাগছে বুঝতে পারে না।

A SUVOM CREATION